পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

কারমিলা

জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু

অনুবাদ : লুৎফুল কায়সার



যে বই পড়ে ব্রাম স্টোকার "ড্রাকুলা" লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন!

অনুবাদকের উৎসর্গ



শ্রদ্ধেয় শান্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়কে
আপনার 'ইটি' না পড়লে কখনোই কারমিল্লা সম্পর্কে জানতে পারতাম না,
ওটাই ছিলো ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে পড়া আমার প্রথম বই।
শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার চক্রবর্তীকে
আপনার অনুবাদে প্রথম আমার 'কারমিল্লা' পড়া হয়
এবং তিন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,
সাজেদুল রনি ভাই, মাহবুবুল ভাই এবং গুড্ডু ভাইকে,
ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।



ভূমিকা



ভূতের গল্প আর ভয়ের গল্প দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

ভয়ের গল্পে ভূত থাকতেও পারে না-ও পারে, আবার সব ভূতের গল্পে ভয় থাকবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা রম্য, দুঃখী, রাগী, দয়ালু ইত্যাদি হরেকরকম ভূত দেখতে পাই। আবার ভয়ের গল্পেও ভূত থাকতেও পারে, না-ও পারে। ভয় মানুষের মনের একটা অন্ধকার দিক, আদিম প্রবৃত্তির একটা। তাই ভূত থাকুক আর না থাকুক, মানুষ ভয় পায় নানা কারণে, নানা ক্ষেত্রে।

ভূত আসলে কী?

মানুষ মরে গেলে তার বিদেহী, অতৃপ্ত আত্মা ভূত অর্থাৎ নিরাকার এক সত্তা হয়ে ফিরে আসে, এমনটাই সব লেখক-গল্পকার-সাহিত্যিকরা চর্চা করে গেছেন তাদের লেখায়। সাহিত্যের আদি যুগ থেকে লাখো গল্প-উপন্যাসে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাভাষাতেও এমন চর্চার উদাহরণ রয়েছে প্রচুর।

একসময় এমন হলো, ভূতের গল্প আর ভয়ের গল্প লেখক-পাঠক উভয়ের কাছেই একই অর্থ হিসেবে ধরা দিতে লাগলো। বিশেষত ১৭-১৮ শতকের দিকের প্রায় সকল সাহিত্যে এই ধারাটা বেশ প্রচলিত ছিলো। পাঠক সেদিকে ঝুঁকছিলোও বেশ। তবে ভিন্ন ধারা সবক্ষেত্রেই থাকে। থাকে প্রথা ভাঙার শ্লোগান। আর সেই প্রথা ভাঙার জন্যও গড়ে উঠল কিছু শক্তিশালী লেখক ভাবনা।

সেই শতকেই আমরা পেলাম ফ্রাঙ্কেন্সটাইন (মেরি শেলি, ১৮১৮), দ্য ভ্যাম্পায়ার (জন পলিডরি, ১৮১৯), ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড (রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, ১৮৮৬) দ্য পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে (অস্কার ওয়াইল্ড, ১৮৯০)। শুধু কি তা-ই? সে সময় এডগার অ্যালান পো তো ব্যতিক্রমধর্মী আর ভয়ের গল্পের নতুন একটা জগতই সৃষ্টি করেছিলেন তার সাহিত্য আর ছোটগল্পের মাধ্যমে। আর সেই ১৮০০ শতকেরই শেষদিকে এসে, ১৮৯৭-তে পেলাম সর্বকালের সবচেয়ে আলোচিত হরর অর্থাৎ ভয়ের উপন্যাস, ড্রাকুলা (ব্রাম স্টোকার)।

এসবই ভয়ের এবং ভৌতিক গল্পপ্রেমীদের জানা। পৃথিবীসেরা ভয়ের গল্পগুলো কি তাদের পাঠের বাইরে থাকবে? তা-ই কি হয়?

আর এখানেই অনেকে কোনো এক রহস্যময় কারণে ভুলে যান একটি নাম। *কারমিল্লা।*

কারমিল্লা

আইরিশ সাহিত্যিক জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু ১৮৩৫ এর দিকে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। মূলত আধিভৌতিক ধারার দিকেই তার লেখার ভাবনা এগুতো। উদ্ভট, খেয়ালি সব ভাবনা নিয়ে লেখতেন তিনি। গল্প সংকলন *পার্সেল পেপার*, *ইন আ গ্লাস ডার্কলি*, *দ্য রুম ইন দ্য ড্রাগন ভলান্ট*, *আংকেল সাইলাস* – এসবই তার বেশ আলোচিত এবং উদ্ভট ভাবনার খ্যাতি পাওয়া ভয়ের উপন্যাস।

তবে, এসবের জন্য নন, তাকে বিশ্ববাসী আদতে মনে রেখেছে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত *কারমিল্লা* নামের একটি উপন্যাসের জন্য। এটাকে বলা হয় বিশ্বের প্রথম নারী ভ্যাম্পায়ারকেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম।

শুধু তা-ই নয়, ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' রচনার মূল অনুপ্রেরণা ছিলো এই সুন্দরী নারীকেন্দ্রিক ভ্যাম্পায়ার উপন্যাসটি।

ভ্যাম্পায়ার আসলে কী?

মৃত মানুষের জেগে ওঠা আত্মা বা তার বেশে ফিরে আসা কোনো অপশক্তিকেই ভ্যাম্পায়ার বলে দাবি করা হয়।

ছয় হাজার বছর আগে প্রাচীন সুমেরীয় এবং ব্যবিলনীয় সভ্যতার মানুষরাও ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করত বলে মনে করা হয়। একিমো বা এডিমো নামে এক ধরনের পিশাচকে ভয় পেত তারা, যারা মানুষের আত্মা চুষে নিত বলে বিশ্বাস করা হতো। নব্যপ্রস্তরযুগের কিছু সমাধির ওপর স্থাপন করা পাথরখণ্ড থেকে গবেষকরা জানতে পারেন ওই পাথরগুলো রাখা হয়েছিলো যাতে কবরে শায়িত ব্যক্তি ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে না পারে।

প্রাচীণ মিশরীয়রদের বিশ্বাস ছিলো মৃতকে ঠিকমতো সমাহিত না করা হলে সে অতৃপ্ত আত্মায় পরিণত হয় এবং মানুষের রক্ত পান করে বেড়ায়। মিশরীরদের দেবী সেখমেট রক্ত পান করত বলে জানা যায়।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ভ্যাম্পায়ার সন্দেহে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বুকের মধ্যে কাঠ বা লোহার গজাল ঠুকে ভ্যাম্পায়ার হত্যা করার এই রীতিটি অনেকদিন প্রচলিত ছিলো। এমনকি ইউরোপে ১৮ শতকের দিকে ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস এতটাই গভীর ছিলো যে অনেক ক্ষেত্রে মৃতদের কবর থেকে তুলে আবারও হত্যা করা হতো যাতে তারা কোনোভাবেই ফিরে আসতে না পারে। প্রচলিত ধারণা মতে, ভ্যাম্পায়ার তাড়াতে রসুনের ব্যবহার ছিলো দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। ভ্যাম্পায়ার থেকে দূরে থাকতে আগুন, লবণ, লোহা ইত্যাদিও ব্যবহার করা হতো। ইউরোপে রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত নারীদের ক্ষেত্রে সে সময় মনে করা হতো তারা ভ্যাম্পায়ারের শিকার।

কারমিল্লা

গত দুই শতক ধরে ভ্যাম্পায়ারভিত্তিক অজস্র সাহিত্য রচনা হয়েছে। কারমিল্লা কেন সেসবের থেকে আলাদা?

ইউরোপে থেকে তৎকালীন প্রচলিত ধারা, মিথ, বিশ্বাসকে কলমের জোরে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা সহজ কাজ নয়। জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু সেটা কারমিল্লায় করে দেখিয়েছেন। এক রহস্যময়ী নারী ও তার নানাবিধ কার্যকলাপকে চিরায়ত ইউরোপীয় গথিক হরর ধারায় তুলে ধরার পাশাপাশি তুলে এনেছিলেন তৎকালীন সমাজের কিছু চিত্র। তুলে এনেছিলেন নারী-সমকামিতার মতো স্পর্শকাতর (তৎকালীন সমাজে) বিষয়। রক্তের ধারা-অমরত্ব-পৈশাচিক শক্তি-ভ্যাম্পায়ার মিথের এসব বিষয়ও বেশ সুন্দর করেই তুলে আনা হয়েছিলো উপন্যাসটিতে।

সম্ভবত সেজন্যেই ব্রাম স্টোকার ড্রাকুলা রচনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এই উপন্যাসটি থেকে। এমনকি প্রচলিত একটি ভাবনা অনুযায়ী, ড্রাকুলা উপন্যাসে ড্রাকুলার স্ত্রী হিসেবে দেখানো তিন সমকামী পিশাচিনী আসলে এই কারমিল্লা উপন্যাসের মিরকাল্লার (কারমিল্লা) প্রতি ট্রিবিউট হিসেবেই লেখা হয়েছিলো।

তবে আফসোসের কথা, বাংলাভাষী পাঠকের কাছে আজও এই কারমিল্লা কিংবা জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু নামটা পরিচিত নয় বললেই চলে। কেন?

তার সাহিত্য নিয়ে বাংলা চর্চার অভাবটাই সম্ভবত মূল কারণ।

ড্রাকুলা হোক, ভ্যাম্পায়ার হোক, কিংবা অন্যসব রক্তচোষক কিংবা পিশাচের গল্পই হোক, বাংলাভাষী পাঠক বরাবরই ভয়ের গল্পের পাগল বলেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সম্প্রতি প্রকাশিত লুৎফুল কায়সারের অনুবাদে ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা'র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠক সাদরে লুফে নিয়ে সেটারই আরেক দফা প্রমাণ দিয়েছে। এবার সেই সু-অনুবাদকের হাত ধরেই বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে কারমিল্লার প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

অসাধারণ এই কাজটির জন্য অনুবাদককে শুভেচ্ছা। সেইসাথে বেনজিন প্রকাশনীকেও শুভকামনা জানাই এমন কাজে সফলতার জন্য।

ড্রাকুলা-কারমিল্লার পর ক্লাসিক সব হরর সাহিত্যের এমন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আরও আসুক, পাঠকপ্রিয়তা পাক – হররপ্রেমী হিসেবে আমার এটাই চাওয়া।

ভয়ের গল্প হোক আর ভূতের গল্প হোক – ভালো গল্পের জয় হোক সবখানে।

বাপ্পী খান
লেখক
ঢাকা, বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা



পাঠক পাশে থাকলে সবকিছুই সম্ভব। ড্রাকুলার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদকে আপনারা এতটা ভালোবাসা দেবেন তা কখনো ভাবতেও পারিনি। বইটি দুই বাংলাতেই বেশ সমাদৃত হয়েছে। আপনারা পাশে না থাকলে কিছুই হতো না।

সেই সাহস থেকেই ড্রাকুলা নামের বিরাট উপন্যাসটি মূলত যে উপন্যাসিকার ইনফ্লুয়েন্সে লেখা হয়েছিলো, সেই 'কারমিল্লা'র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে হাত দেওয়া।

আইরিশ লেখক জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু উপন্যাসিকাটি লিখেছিলেন ১৮৭১-১৮৭২ সালে। 'দ্য ডার্ক ব্লু' নামের ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো উপন্যাসিকাটি। পরবর্তীতে পুরো বই আকারে প্রকাশিত হয় কাহিনিটি।

এটিই ছিলো ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত সফল বই।

তো প্রথমেই আসি 'কারমিল্লা' নামটি নিয়ে। মূলত স্প্যানিশ এই নামটির অর্থ 'ফল বাগানের মেয়ে'। ইংরেজ বা আইরিশরা সাধারণত 'কারমিলা' উচ্চারণ করে। তবে লে ফানুর পরবর্তী লেখালেখি এবং কিছু গবেষকের কাজ থেকে বোঝা যায় যে ওই আমলে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারের অধীনে কাজ করা ইংরেজ এবং ফরাসিদের বাচনভঙ্গি অনেকটাই বদলে গেছিলো। কোনো শব্দের শেষের 'LL' এ তারা 'ল্ল'ই উচ্চারণ করতো। যেমন – 'বেল্লা', 'ইসাবেল্লা'। ওই হিসাবেই উচ্চারণটি কারমিল্লাই রেখে দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক রক্তপিশাচদের নিয়ে ড্রাকুলার ভূমিকাতে একগাদা কথা লিখেছিলাম, কারমিল্লাতেই বা বাদ যাবে কেন? মূলত ইউরোপে ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলো এসেছে স্ল্যাভিক কিংবদন্তি থেকে। তবে এর বহু আগেই পৃথিবীর নানান সংস্কৃতিতে রক্ত-পিপাসু পিশাচদের কথা ছিলো।

যেমন – মেসোপটেমিয়ার লামাশতু, যার মাথাটা সিংহের কিন্তু শরীরটা গাধার; গ্রিক কিংবদন্তিতে আছে নিশাচর স্ট্রিবোসের কথা। ফিলিপাইনে অদ্ভুত রকমের মানানাঙ্গাল নামের এক নারী পিশাচের কথা আছে যাদের শরীরের অর্ধেকটা রাতের বেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রক্তের খোঁজে ওরা ঘুরে বেড়ায় এখানে-সেখানে। মালয়েশিয়ার ফেনাংগালানও খানিকটা কাছাকাছিই, তবে এই মহিলাদের কেবল মাথাটা আলাদা হয়ে যায় আর বেরিয়ে পড়ে রক্তের খোঁজে।

অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের কিংবদন্তিতে ইয়াবা-মা-ইয়া-হু নামের এক প্রকার বানরের মতো প্রাণীর কথা আছে যাদের হাতে একটা বিরাট ফুটো থাকে, ওই

ফুটো দিয়ে তারা রক্ত চুষে খায়!

ইউরোপে ভ্যাম্পায়ারেরা প্রচুর এলিট শ্রেণির পিশাচরূপে বিবেচিত হয়। মূলত মধ্যযুগের পূর্ব ইউরোপে এদের সংক্রান্ত কুসংস্কার সবচেয়ে বেশি ছিলো। পূর্ব ইউরোপ দীর্ঘকাল পশ্চিম থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো। ইউরোপের যত কুসংস্কার তার বেশিরভাগই এসেছে এই অঞ্চল থেকে।

সময়টা আঠারো শতক। একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছে এককালের সুপার পাওয়ার অটোমান সাম্রাজ্য। এই সুযোগে তাদের কাছ থেকে পূর্ব ইউরোপের নানান অঞ্চলের দখল নিতে শুরু করে অস্ট্রিয়ান সেনারা। সৈন্যরা অবাক হয়ে খেয়াল করে যে ওই অঞ্চলে মাঝে মাঝেই কবর খুঁড়ে দেখা হয়, লাশের মাথা কেটে ফেলা হয়, মুখে রসুন গুঁজে দেওয়া হয়!

এই সংক্রান্ত খোঁজ খবর করতে গিয়ে দেখা যায় যে ওখানের বেশিরভাগ মানুষই মনে করে মৃত্যুর পর লাশেরা রক্তপিশাচ বা ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। এই আতঙ্ক এতটাই ছড়িয়েছিলো যে অস্ট্রিয়ার রানির ব্যক্তিগত চিকিৎসককে ওই অঞ্চলে আসতে হয়। তিনি নানান পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই। কবর খোঁড়া বন্ধ করতেও আইন করা হয়।

কিন্তু ততদিনে পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে গেছে ভ্যাম্পায়ারের গালগল্প। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ড্রাকুলার ভূমিকাতে অনেক কিছুই লিখেছি।

কারমিল্লাতে ফিরে আসি। লে ফানু মূলত অতিপ্রাকৃত গল্প লিখতে পছন্দ করতেন। গথিক পরিবেশ, নির্জন প্রাসাদ, কিছু নিঃসঙ্গ নারী চরিত্র, এসবের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন তিনি। পাঠকেরা একটু পড়লেই খেয়াল করবেন যে কারমিল্লাতে কোনো পুরুষ চরিত্রই তেমন ফুটে ওঠেনি। নারী চরিত্রগুলো খুবই শক্তিশালী এমনকি কারমিল্লার মায়ের চরিত্রটি পর্যন্ত অনেকটা বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। লরার বাবার চরিত্রটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া পুরুষ চরিত্র বলা যায়।

সমকামিতার ব্যাপারটা নিয়েও কিছু না বললেই নয়। লে ফানু ছিলেন বেশ রক্ষণশীল চিন্তাধারার মানুষ। তাই কাহিনির খলনায়িকাকে তিনি সমকামী রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। এছাড়া কিছু লাইনে প্রাচীন প্যাগানিজমের প্রতিও অশ্রদ্ধা দেখা যায়। সেকালের বেশিরভাগ লেখকই এসব বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

ব্রাম স্টোকারের লেখার ভঙ্গি ছিলো খুবই ঝরঝরে আর পাঠকের সাথে মানানসই। অপরদিকে লে ফানুর লেখার ভঙ্গি বেশ খানিকটা গম্ভীর। ব্যাপারটা

বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিলো আমার জন্য।

যাইহোক, কারমিল্লা যেহেতু ড্রাকুলার প্রধান ইনফ্লুয়েন্স ছিলো তাই দুটি বইয়ের কিছু ব্যাপারে আলাপ না করলেই নয়।

ড্রাকুলা সাধারণত মানুষ রূপে বা বাদুড়ের রূপ ধরে রক্ত চুষতো, কিন্তু কারমিল্লা রক্ত চোষার সময়ে বিরাটাকৃতির একটা বিড়ালে পরিণত হয়।

ড্রাকুলার লুসির সাথে কারমিল্লার খানিকটা মিল আছে, ঠিক তেমনি মিনার সাথে মিল আছে লরার।

বইটি পড়লে যে কেউই বুঝতে পারবেন যে আব্রাহাম ভ্যান হেলসিং চরিত্রটি ব্রাম স্টোকার তৈরি করেছিলেন এই বইয়ের ব্যারন ভোর্ডেনবার্গ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে।

'ড্রাকুলা'স গেস্ট' নামে ব্রাম স্টোকারের একটি ছোটগল্প আছে, অনেকের মতে যেটি ড্রাকুলার ছেঁটে ফেলা প্রথম অধ্যায়। ওই গল্পটিরও দৃশ্যপট স্টিরিয়া, ওখানে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে। এছাড়া কাউন্টেস ফন গ্র্যাৎস নামের এক নারী ভ্যাম্পায়ারের কথা রয়েছে। অনেকের মতেই ওই চরিত্রটি কারমিল্লার আদলে তৈরি।

এছাড়া ড্রাকুলার সেই তিন নারী ভ্যাম্পায়ারের চরিত্রেও কারমিল্লার প্রভাব বিদ্যমান।

যাইহোক, গোটা পৃথিবীর ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত কিংবদন্তি নিয়েই তো কথা হলো। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশের?

ড্রাকুলার ভূমিকাতেও বলেছিলাম আমাদের উপমহাদেশের ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত মিথ অনেক পুরোনো। এত তথ্য আছে যে লিখতে হলে একটা পুরো বই হয়ে যাবে। ইউরোপের মতো আমাদের এখানে রক্তচোষারা অত এলিট কিছু না।

আমাদের কিংবদন্তি অনুযায়ী রক্তচোষা হলো 'রক্তপিশাচ' হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। এই ধাপে পিশাচেরা শুধু রক্ত খায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা মানুষের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও খাওয়া শুরু করে, হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ রক্তপিশাচ।

যাইহোক, উপমহাদেশীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আত্মহত্যার মাধ্যমে একজন মানুষ কোনো প্রকার ভ্যাম্পায়ারের কামড় ছাড়াই ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে পারে। এটি কিন্তু স্লাভিক কিংবদন্তিতে নেই। ভালো করে খেয়াল রাখুন এইটুকু, কারণ বইয়ের ভেতর আপনার জন্য চমক অপেক্ষা করছে!

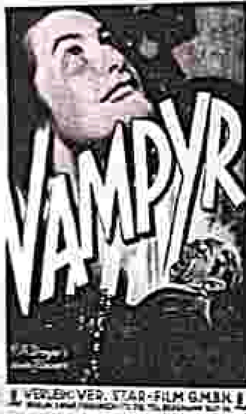
যেখানে দেড়শো বছর আগে পশ্চিমা লেখকেরা আমাদের ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত

কিংবদন্তি নিয়ে ঘেঁটেছেন, সেখানে আমরা তেমন কিছুই করতে পারিনি!

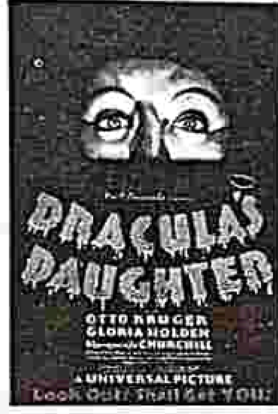
তবে ভারতীয় বিখ্যাত গ্রাফিক নভেল লেখক শমীক দাশগুপ্ত'র 'দ্য ক্যারাভান' সিরিজটি এইক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ইন্টারেস্টেড যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন।

তো, কারমিল্লা নিয়ে কি সিনেমা-টিনেমা হয়নি?

১৯৩২ সালে 'ভ্যাম্পায়ার' নামে একটি সিনেমা তৈরি হয়। তবে এতে সমকামিতার ব্যাপারটুকু পুরো ছেঁটে ফেলা হয়।



১৯৩২ সালের সিনেমা



১৯৩৬ সালের সিনেমা



১৯৭৭ সালের সিনেমা



১৯৮০ সালের টিভি-শো

১৯৩৬ সালে বানানো হয় 'ড্রাকুলা'স ডটার', এটিও কাছাকাছি অ্যাডাপ্টেশন।

১৯৬৩ আর ১৯৭০ সালেও দুটি সিনেমা হয়েছিলো।

১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে টিভি-শো বানানো হয়েছিলো।

১৯৭৭ সালে মেক্সিকোর আলোচিত-সমালোচিত কাল্ট ক্লাসিক চলচ্চিত্র 'আলুকারদা' তৈরি হয়েছিলো খানিকটা কারমিল্লার অনুকরণে।

তো এই আরকি।

বইটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের চেষ্টা করেছি, বাকিটা পাঠকদের হাতে। ধন্যবাদ বেনজিন প্রকাশনা সংস্থা, সুলেখক বাপ্পী খান ভাই, সম্পাদক মিঠু ভাই এবং প্রুফরিডার মুবিন ভাইকে।

ভয়ের জগতে সবার যাত্রা শুভ হোক।

লুৎফুল কায়সার
রাজশাহী

বইটির লেখক জোসেফ শেরিড্যান লে ফানু বেশ কট্টরপন্থী চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। সেকালের বেশিরভাগ লেখকের মতো তিনিও সমকামিতা ব্যাপারটাকে নেতিবাচকভাবেই দেখতেন। তাই খলনায়িকাকে তিনি সমকামী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পুরো বইতে কিছু স্পর্শকাতর বর্ণনা রয়েছে যা অনেকেরই ভালো না-ও লাগতে পারে। বর্ণনাগুলো পাঠের ক্ষেত্রে পাঠকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে প্রভাবিত না হয়ে পাঠ করার পরামর্শ রইল।

প্রারম্ভিকা



যে কাহিনি আমি তুলে ধরতে যাচ্ছি তার সাথে ডা. হেসিলিয়াসের লেখা একটি বিস্তারিত প্রবন্ধও সংযুক্ত রয়েছে। প্রবন্ধটিতে সবকিছুকে বৈজ্ঞানিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যে ভদ্রমহিলার তিনি চিকিৎসা করেছিলেন, তার নানান সমস্যার কথা বেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে সেখানে। পুরো প্রবন্ধটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। যে-কোনো ডাক্তার সেটি পড়লে উপকৃত হবেন।

যাইহোক, আমি মূলত এই কেসটি প্রকাশ করছি সাধারণ মানুষের পড়ার জন্য। সেজন্য ডাক্তারের কথাগুলো দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। অসুস্থ সেই ভদ্রমহিলা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটির অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। তার বক্তব্যের খানিকটা অসংলগ্ন মনে হতে পারে, এমন অনেক কথাই রয়েছে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। নিজের প্রবন্ধে এসবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক সময়ে ডা. হেলিয়াস বলেছেন, "মূলত কিছুই অসম্ভব নয়, তারপরেও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানও অসহায়, আশা করি ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা এসবের সঠিক কারণ দর্শাতে পারবেন।"

মহিলার বর্ণনা আমি পড়েছি। তিনি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই কাগজগুলো খুঁজে পাওয়ার পর খানিকটা দোটানায় ছিলাম। সাধারণ মানুষের জানা উচিত এসব ব্যাপারে, কিন্তু এত বছর আগের একটি ঘটনা কি তুলে আনা ঠিক হবে? তাছাড়া মহিলার ব্যক্তিগত অনেক কথাই রয়েছে এতে। ভাবলাম উনার অনুমতি নেওয়া দরকার, আর কে জানে, তার কাছ থেকে যদি নতুন কোনো তথ্য পাই?

কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে উনি বেশ অনেক বছর আগেই মারা গেছেন।

আমার মনে হয় না ঘটনাটি প্রকাশে আর কোনো বাধা আছে। তবে মহিলার সাথে কথা বলে, আরো খানিকটা জানতে পারলে ভালোই হতো। সে উপায় তো আর নেই। মহিলার বক্তব্যটুকু তুলে দেওয়ার আগে বলে রাখছি, কয়েক জায়গায় উনার লেখা বিশেষ কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

অজানা আতঙ্ক



ধনী বা অভিজাত বলতে যা বোঝায় তেমনটা না হলেও স্টিরিয়াতে বেশ বড় একটা প্রাসাদে বাস করি আমরা। জায়গাটাকে খামারবাড়িও বলা যায়। এই অঞ্চলে অল্প আয়েও বেশ ভালোই থাকা যায়। বছরে আট-নয়শো পাউন্ড রোজগার হয়তো পশ্চিম ইউরোপে কিছুই নয়, কিন্তু এই পিছিয়ে থাকা এলাকায় অংকটা রীতিমতো ঈর্ষনীয়। তারমানে বুঝতেই পারছেন, এলাকার হাতে গোনা ধনী লোকদের মধ্যে আমাদেরও বেশ নামডাক আছে। আমার বাবা ইংরেজ, আমার নামটাও ইংরেজদের মতোই, যদিও কখনোই ইংল্যান্ড দেখা হয়নি আমার। এই নির্জন (প্রায়), সেকেলে অঞ্চলে সবকিছু এতই সস্তা, যে মাঝে মাঝে অবাক লাগে... যদি আমাদের আয় আরেকটু বেশি হতো, তবে সেগুলো কোথায় খরচ করতাম? এই দিয়েই তো বেশ আনন্দে হেসে-খেলে বেঁচে আছি, নানারকম বিলাসিতারও অভাব নেই।

আমার বাবা অস্ট্রিয়ান সরকারের অধীনে* চাকরি করতেন। অবসরের পর যে ভাতা পেয়েছিলেন তার সাথে ইংল্যান্ডের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করা টাকা মিলিয়ে বেশ সস্তায় এই প্রাসাদ এবং সংলগ্ন ছোট্ট এলাকা কিনে নেন উনি। এই অঞ্চলের মানুষ দরদামে বেশ অনভিজ্ঞ। পশ্চিম ইউরোপে এমন একটি প্রাসাদের দাম কয়েকগুণ বেশি হতো। তারপরেও বাবা যে দাম দিয়েছেন, আশেপাশের কোনো জমিদার হলে এটুকু দামও দিতেন না।

ছবির মতো সুন্দর এমন জায়গা পৃথিবীতে আর আছে কি-না সন্দেহ। ছোট্ট একটা বনের ঠিক সামনেই আমাদের প্রাসাদ। প্রাসাদের চারপাশে পরিখা, তারপর একটা সরু রাস্তা। পরিখা পেরিয়ে প্রাসাদে আসার জন্য কাঠের একটা সেতু রয়েছে। সেতুটা চাইলে তুলে ফেলা যায়, যদিও আমি কখনো ওটাকে তুলতে দেখিনি। কে জানে, তুলবার যন্ত্রে হয়তো জং ধরে গেছে!

পরিখার পানি ছোট ছোট পার্চ মাছে ভরতি, বিকালে সেখানে চরে বেড়ায় অসংখ্য রাজহাঁস, সেতুর দুপাশে ফুটে থাকা সাদা পদ্মফুলগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন ঘোর লেগে যায়!

সামনের দিকে অনেকগুলো জানালা নিয়ে যেন অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের প্রাসাদ, উঁচু একটা মিনার আর গথিক ধাঁচের বেশ পুরোনো

---

* সেকালে ওই অঞ্চলের শিক্ষিতের হার খুব কম ছিলো। তাই অস্ট্রিয়ান সরকারের উচ্চপদে ইংরেজ আর ফরাসিদেরই বেশি নিয়োগ দেওয়া হতো।

একটা গির্জাও রয়েছে।

ওই মিনারে দাঁড়ালে মনে হয় আমি যেন নির্জন দ্বীপের সেই রহস্যময় মেয়েটি* ।

সামনের সেই সরু রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট কিছু গাছ, যেন কোনো দক্ষ চিত্রশিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। বলে বোঝাতে পারবো না কতটা সুন্দর সবকিছু। বনের মধ্যে একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে ডানদিকে গেলেই নদীটা। গথিক ধাঁচের বেশ পুরোনো একটা সেতু দিয়ে নদীটা পেরিয়ে আরেকটু গেলেই বড় রাস্তা।

শুরুতেই বললাম না, এলাকাটা বেশ নির্জন? এবার খানিকটা বুঝিয়েই বলি, শুনুন। হলঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারলেই দেখা যায় সেই সরু রাস্তা, তারপর অজস্র ঘন বৃক্ষরাজি। বনটি ডানদিকে পনের মাইল এবং বামদিকে বারো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সবচেয়ে কাছে যে গ্রামটায় জনবসতি রয়েছে সেটাও ইংল্যান্ডের হিসাবে* প্রায় সাত মাইল দূরে।

সবচেয়ে কাছের দুর্গ? সেটা আরো দূরে। আমাদের প্রাসাদ থেকে ডানদিকে প্রায় বিশ মাইল দূরত্বে একটি অনেক পুরোনো দুর্গে থাকেন বৃদ্ধ জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ।

একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই যে একটু আগে লিখলাম, 'সবচেয়ে কাছে যে গ্রামটায় জনবসতি রয়েছে', এর একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। এখান থেকে জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের প্রাসাদের দিকে, ঠিক তিন মাইল দূরে একটা পরিত্যক্ত গ্রাম আছে। গ্রামটা বেজায় অদ্ভুত, স্থানীয় লোকেরা ওদিকে যেতেই চায় না।

গ্রামের ভেতর বেশ সুন্দর একটা পুরোনো গির্জা আছে। দরজা ভেঙে পড়েছে, দেয়ালের প্লাস্টার খসে গেছে, ছাদটা তো একেবারেই নেই বলতে গেলে। তারপরেও দূর থেকে কেমন যেন মনোরম দেখায় ওটা। ওই গির্জার চত্বরেই কার্নস্টাইন পরিবারের লোকেদের বেশ কয়েকটা সমাধিগৃহ। এই বন,

---

* 'দ্য লেডি অব শ্যালট' কবিতার নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা মেয়েটির কথা বলা হয়েছে। এক অদ্ভুত অভিশাপের কারণে সে কখনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে পারতো না।

* সে আমলে দূরত্বের ব্যাপারে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়া/জার্মানির হিসাবে পার্থক্য ছিলো। এককের নাম এক হলেও, অস্ট্রিয়াতে যতটুকু দূরত্বে এক মাইল হতো, ইংল্যান্ডে তার চেয়ে খানিকটা বেশি দূরত্বে হতো।

আশেপাশের এলাকাগুলো, এমনকি আমাদের প্রাসাদটাও এককালে এই বংশেরই জমিদারির অংশ ছিলো। এখন ওদের আর কেউ বেঁচে নেই।

গ্রামটা থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই ওদের প্রাচীন প্রাসাদ, যেটার অনেকটাই গ্রাস করেছে নানান আগাছা। বলা বাহুল্য ওখানেও কেউ থাকে না। পুরো প্রাসাদটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো একটা ছোট্ট শহর, সেটাও পরিত্যক্ত।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন জনহীন শহরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওই প্রাসাদ।

যাইহোক, ওই অঞ্চলে কেন কেউ থাকে না, তা নিয়ে বেশ অদ্ভুত একটা কাহিনি প্রচলিত আছে। পরে কখনো বলা যাবে।

আমাদের প্রাসাদের বাসিন্দাদের নিয়ে কিছু বলা যাক। সাধারণ চাকর-বাকরেরা থাকে প্রাসাদ সংলগ্ন ছোট্ট ঘরগুলোতে, এছাড়া কিছু আশ্রিতও রয়েছে ওগুলোতে। ওদের নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। মূল প্রাসাদে আমরা মাত্র কয়েকজন থাকি। মাঝে মাঝে অবাক লাগে, এত বড় একটা প্রাসাদে... আমরা মাত্র কয়েকজন!

বাবার বয়স ক্রমাগত বাড়ছিলো, সব কিছু কেমন যে বুড়িয়ে যাচ্ছিলো। ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিলো আমাদের প্রাসাদের বিষণ্ণতা! মনে হতো এক অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি আমি, এ এক বিচিত্র অনুভূতি!

যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স ছিলো উনিশ। এরপর প্রায় আট বছর পেরিয়ে গেছে, লিখতে বসেছি এই পাণ্ডুলিপি। এখনো চোখ বন্ধ করলে মনে হয় যেন এই তো কালকের ঘটনা!

আমার মা ছিলেন স্টিরিয়ারই বাসিন্দা। আমি অনেক ছোট থাকতেই উনি মারা যান। তো বুঝতেই পারছেন, পরিবার বলতে শুধু আমি আর বাবা।

ছোট থেকেই আয়ার কাছে মানুষ আমি। গোলগাল চেহারার সেই মিষ্টি মহিলা কখন যে আমার ছোটবেলার স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছেন, নিজেও বুঝিনি। উনি মাদাম* পেরোডোন, বার্নের অধিবাসী। মাতৃহারা সেই ছোট্ট আমাকে ভালোবাসা আর স্নেহে ভরিয়ে রেখেছিলেন এই মহিলা।

---

* মাদাম এবং মাদামোয়াজেল দুটিই মূলত ফরাসি সম্বোধন। কুমারী মেয়েদের নামের আগে মাদামোয়াজেল ডাকা হয় আর বিবাহিত মহিলাদের নামের আগে মাদাম। কারো যদি বিয়ের পরে তালাকও হয়ে যায়, তবুও তাকে মাদাম-ই ডাকা হয়। এছাড়া এই দুই মহিলার নামের ফরাসি উচ্চারণ যথাক্রমে মাদাম পেঁদ্রোন এবং মাদামোয়াজেল দ্যঁ লা ফঁতে। লেখক যা লিখেছেন তা মূলত ইংরেজ/আইরিশদের উচ্চারণ। লেখক যেহেতু আইরিশ, পুরো বইতে আমরা লেখকের উচ্চারণই ব্যবহার করবো।

তারপরেও, মা তো মা-ই। তাই না? মাঝে মাঝেই চুপচাপ উদাস মনে বসে থাকতাম। মনে করার চেষ্টা করতাম মায়ের মুখটা। কিন্তু কিছুই মনে আসত না। মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করতাম, "কেন? কেন অত ছোট বয়সে উনি মাকে কেড়ে নিলেন আমার কাছ থেকে?"

যাইহোক, মূল প্রাসাদে আরো একজন ছিলেন। মাদামোয়াজেল* ডি লাফন্টেইন। অল্পবয়স্ক চটপটে মহিলা, প্রাসাদের সবকিছু সামলাতে মাদাম পেরোডোনকে সাহায্য করতেন তিনি, ইংল্যান্ডের ভাষায় যাকে বলে, 'সহকারী আয়া'।

রাতের বেলা যখন চাকর-বাকরেরা কাজ শেষ করে নিজেদের ঘরে ফিরে যেত, তখন নির্জন হয়ে যেত আমাদের প্রাসাদটা।

কেমন যেন অস্বস্তিকর আর অপার্থিব এক নিঃস্তব্ধতা ঘিরে ধরত আমাদের চারজনকে।

একসাথেই রাতের খাবার খেতে বসতাম চারজন। পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপারটা বেশ খারাপ নজরেই দেখা হয়, ওখানে তো আয়াদের আলাদা খাবার ঘর আছে। কিন্তু এদিকে এসব খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়া উনাদের দুজনকে বেজায় ভালোবাসতাম আমি আর বাবা।

খাবার টেবিলে মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইন কথা বলতেন ফরাসি আর জার্মান ভাষায়, মাদাম পেরোডন ফরাসির সাথে সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিও বলতে পারতেন... ওদিকে আমি আর বাবা বলতাম পুরোদস্তুর ইংরেজি। বাবার ভয় ছিলো যে ইংল্যান্ড থেকে এত দূরে থেকে আমি হয়তো ভাষাটা ভুলে যাবো, তাই উনি বেশিরভাগ সময়েই আমার সাথে ইংরেজিতেই কথা বলতেন। তো যাইহোক, ইউরোপের এতগুলো ভাষা মিলে আমাদের খাবার টেবিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হতো... সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বাইরের কেউ এসব দেখলে নির্ঘাত হেসে ফেলত। যাইহোক এ নিয়ে বেশি কিছু বলা ঠিক না, ভাষা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর ইউরোপের প্রতিটি জাতিই নিজেদের ভাষা নিয়ে গর্বিত।

আমার প্রায় সমবয়সি কিছু বান্ধবী ছিলো, মাঝে মাঝেই ওরা আসত আমাদের প্রাসাদে, আমিও যেতাম ওদের বাড়ি।

এই ছিলো আমাদের সামাজিকতার বহর। তাছাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ ছিলো কম, সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশির বাড়ি ছিলো

পাঁচ-ছয় লিগ* দূরে। সবমিলিয়ে বুঝতেই পারছেন, বেশ নিঃসঙ্গ আর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ছিলো আমার।

বড় হতেই খেয়াল করলাম দুজন আয়ারই আচরণ খানিকটা বদলে যাচ্ছে। আমাকে কেমন যেন চোখে চোখে রাখতেন উনারা। বারবার বোঝাতে চেষ্টা করতেন, 'আমি মেয়ে মানুষ, অমুক করা উচিত না, তমুক করা উচিত না... হ্যান-ত্যান!' যেন আমি বাবার আদর পেয়ে বখে যাওয়া একটা মেয়ে, আর উনারা গির্জার সন্ন্যাসিনী*। উনাদের খুব একটা দোষ দেই না, ইউরোপের পিছিয়ে থাকা প্রায় সব অঞ্চলের নারীরাই এমন।

বাবা ছিলেন একদম আলাদা। যথেষ্ট মুক্তমনা এবং আধুনিক, আমার জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কখনও ছিলো না তার মধ্যে।

যাইহোক, এখন যে ঘটনার কথা বলবো সেটা সম্ভবত আমার জীবনের প্রথম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আর ভয়ংকরও বটে। ছোটবেলার সেই ঘটনা এখনো ভুলতে পারিনি। অনেকেই মনে করতে পারেন আমি অথযাই এসব লিখছি, এত ছোটবেলার ঘটনা এখানে লেখার কী আছে? তাদের বলবো, একটু ধৈর্য ধরে পড়ুন, তাহলেই বুঝবেন কেন এসব লেখছি। ছোটবেলায় আমি থাকতাম প্রাসাদের ওপরতলার একটা বেশ বড় ঘরে। মসৃণ ওক কাঠের তৈরি ছাদ আর ছোট্ট জানালা, সব মিলিয়ে বেশ মনোরম পরিবেশ। সে সময়ে আমার একজন দাইমা ছিলেন। সারাদিন ঘরের মধ্যে আমার সাথে থাকতেন তিনি। একজন নার্সও রাখা হয়েছিলো, পাশের ঘরেই থাকতেন, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন।

তখন আমার বয়স সম্ভবত ছয় পেরোয়নি, একদিন রাতে হুট করেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম বিছানায়, আমার পাশে সাধারণত দাইমা ঘুমাতেন, কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আশেপাশে তাকালাম, কেউ নেই। মাঝে মাঝে দাইমার রাতের বেলা ঘর থেকে বেরোনোর প্রয়োজন হলে উনি নার্সকে ডেকে দিয়ে যেতেন। দাইমা ফেরার আগ পর্যন্ত উনিই বসে থাকতেন আমার পাশে।

কিন্তু সেদিন উনিও ছিলেন না।

---

* ইংরেজরা তিন মাইলে এক লিগ ধরে থাকে।

* সে আমলে ইউরোপে বখে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের ঠিক করতে তাদের গির্জা-সংলগ্ন আশ্রমে পাঠানোর নিয়ম ছিলো।

একা! ওই পুরো ঘরে আমি একা! কিন্তু ভয় পেলাম না। ছোটবেলাতে আমাকে রূপকথা বা ভূতের গল্প একেবারেই শোনানো হয়নি, বাবার কড়া নির্দেশ ছিলো এ ব্যাপারে। ফলে 'ভয়' জিনিসটা কী সেটা তখনো বুঝে উঠিনি।

ঘরের পর্দা নড়া, মোমবাতির আলোতে ছায়ার কম্পন কিংবা দরজার ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দ... যেসব শুনে এখনকার বাচ্চারা ভয়ে আঁতকে ওঠে, ওগুলো ছিলো আমার কাছে একদমই স্বাভাবিক ব্যাপার।

খানিকক্ষণ এদিক-সেদিন হেঁটে বেড়ালাম। তারপর আবার গিয়ে উঠলাম বিছানায়।

এক অদ্ভুত খেয়াল মনে এলো, "ওরা আমাকে এভাবে একা রেখে চলে গেল কেন? তবে কি আমাকে কেউ ভালোবাসে না?" বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো... কখন যে চোখে পানি চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি। নিজের অজান্তেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কিন্তু তারপরেও কেউ এলো না!

ওরা আমাকে প্রাসাদে রেখে কোথাও বেড়াতে চলে গেল নাকি? আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। ঠিক তখনই খেয়াল করলাম ওকে...

অবাক হয়ে দেখলাম, অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে, হাতদুটো চাদরের ওপর। তীব্র বিস্ময়ে কান্না থেমে গেল আমার, চেয়ে রইলাম সেই মেয়েটির দিকে। এত সুন্দরী কাউকে আগে কখনো দেখিনি! কেমন যেন ঘোর লেগে গেছিলো... এগিয়ে এলো সে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। উঠে বসলো বিছানায়। কাছে টেনে নিলো আমায়, তারপর শুয়ে পড়লো।

অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠলো মুখে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো, ওর শরীরের উষ্ণতায় মিশে ছিলো এক অপার্থিব মাদকতা! ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

যন্ত্রণা... প্রচণ্ড যন্ত্রণা... যেন এক জোড়া সুচ ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছে আমার বুকের গভীরে... না, স্বপ্ন না... বাস্তব।

চিৎকার দিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়! পিছিয়ে গেল সেই মেয়েটা, একটু আগেও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলো সে... এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে কয়েক মুহূর্ত, বড় ভয়ংকর সেই দৃষ্টি। তারপরেই লাফিয়ে নেমে পড়লো মেঝেতে, চোখের পলকে ঢুকে পড়লো খাটের নিচে (অন্তত আমার

এমনটাই মনে হয়েছিলো)।

ভয়!

ভয়ের সংজ্ঞা আমি বুঝেছিলাম সেই রাতে। নিজের শরীরের সর্বশক্তি একত্র করে চিৎকার করলাম... প্রায় সাথে সাথেই ছুটে এলেন দাইমা আর নার্স। এত জোরে চিৎকার দিয়েছিলাম যে প্রাসাদের বাইরের ঘর থেকে প্রধান পরিচারিকা পর্যন্ত ছুটে এলেন কয়েক মিনিট পর।

আমি সব খুলে বললাম।

"আরে না না, এমন কিছুই হয়নি, সবই তোমার কল্পনা," আমার কথাগুলো উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন দাইমা। সবাই নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলো আমায়।

কিন্তু এখনো মনে আছে, উনাদের সবার মুখ-চোখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছিলো আমার কথা শুনে। বিছানার তলা, আলমারির পিছন, টেবিলের তলা; বেশ ভালো করে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলেন পরিচারিকা।

তারপর ফিরে এলেন বিছানার কাছে। বিছানার যে পাশটায় দাইমা ঘুমাতেন, সেখানে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন তিনি, তারপর ফিসফিসে কণ্ঠে দাইমাকে বললেন, "জায়গাটা এখনো গরম আছে, কেউ যে ওখানে শুয়েছিলো সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তুমি তো পাশের ঘরে গেছিলে, তাই না? তাহলে? কে ঘুমালো?"

কোনো উত্তর না দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন দাইমা। বুকের কাছটা তখনো ব্যথা করছিলো।

"উফফ, ব্যথা, দাইমা। এখানে," কোনোমতে বললাম আমি।

উনারা তিনজন বেশ ভালো করে জায়গাটা দেখলেন।

"সুচ ফোটার মতো ব্যথা হয়েছিলো? তুমি নিশ্চিত?" বলে উঠলেন নার্স। কেমন যেন কাঁপছিলো উনার কণ্ঠটা।

"হ্যাঁ, খুব ব্যথা..." ককিয়ে উঠলাম আমি।

"না না, তেমন কোনো চিহ্ন নেই, কোনো সুচ ফোটেনি, মা, সবই তোমার স্বপ্ন," কড়া গলায় বললেন পরিচারিকা।

"হ্যাঁ সেটাই," মাথা নাড়লেন নার্স।

উনারা তিনজন সারারাত আমার ঘরে থাকলেন। সেই থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত দিবা-রাত্রি সবসময়ই আমার ঘরে কেউ না কেউ থাকত। কখনো একা থাকতে দেওয়া হতো না আমায়।

মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। একজন ডাক্তার ডাকা হয়েছিলো পরে। বেশ বয়স্ক ছিলেন তিনি। তার সেই বিষণ্ন গুটি বসন্তের দাগে ভরা মুখ... বাদামি রঙের পরচুলা... এখনো চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখতে পাই। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলেন তিনি। গম্ভীরমুখে পরীক্ষা করতেন আমায়, তারপর নানান তিতকুটে ওষুধ দিতেন। ইশশশ, কী যে বাজে স্বাদ ছিলো সেগুলোর!

সেই রাতের পর থেকেই আমি ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ভীতু হয়ে গেলাম। এতটাই যে দিনের বেলাতেও একা থাকতে ভয় পেতাম।

মাঝে মাঝে বাবা আসতেন আমার ঘরে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মজার মজার কথা বলতেন। নার্স আর দাইমাকে নানান প্রশ্ন করতেন। মানুষটার মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকত। দাইমা মাঝে মাঝেই বলতেন, "তোমার বাবা কত আলাপি, অথচ ছোটবেলায় আমরা শুনেছি ইংরেজরা অনেক গম্ভীর হয়!"

উনাদের সাথে কথা শেষে আমাকে কোলে নিতেন বাবা। পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, গালে চুমু খেতেন, বলতেন, "এসব কিছুই না মা, তুমি কেবল খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছিলে। কিচ্ছু হয়নি তোমার।"

কিন্তু আমার ভয় বিন্দুমাত্র কমেনি। ওই রাতে আমি যা দেখেছি তা স্বপ্ন হতেই পারে না। ওই রহস্যময় সুন্দরী মেয়েটি আসলেই এসেছিলো... কী করে এসেছিলো জানি না, কিন্তু এসেছিলো!

মাঝে মাঝেই ওর কথা বলতাম দাইমাকে।

উনি হেসে বলতেন, "আরে কী বলো, ওই মেয়েটা আসলে আমিই ছিলাম। একটু কাজে বাইরে গেছিলাম, তারপর এসে তোমার পাশে শুয়ে পড়লাম। আর তুমি কি-না ঘুমের ঘোরে আমাকে চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে গেলে... বোকা মেয়ে!"

"হ্যাঁ সেটাই, সেদিন রাতে ও আমাকে ডেকে যেতে ভুলে গেছিলো," উনার সাথে সায় দিতেন নার্স।

কিন্তু আমি জানতাম উনারা মিথ্যা বলছেন। ওই মেয়েটা দাইমা ছিলো না।

একদিন সকালে পরিচারিকা আর নার্স একজন বৃদ্ধ যাজককে নিয়ে এলেন আমার ঘরে। কালো আলখাল্লা পরেছিলো লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কীসব যেন আলোচনা করলেন উনারা।

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মা," আমার দিকে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। শান্ত, সৌম্য সেই মিষ্টি মুখটা এখনো চোখে ভাসে।

"আপনি কে?" অবাক হয়ে বললাম আমি।

"আমি ঈশ্বরের এক তুচ্ছ সেবক মা, এখন আমরা উনার কাছে প্রার্থনা করবো," তারপর আমার হাতদুটো বুকের কাছে জোড়া করিয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, " ঈশ্বরপুত্রের দোহাই, হে মহান পরমপিতা, আমাদের প্রার্থনা শুনুন।"

প্রার্থনাটা আমার বেশ পরিচিত। ছোটবেলাতেই নার্স মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলো আমায়।

আমিও ঠোঁট মেলাতে লাগলাম।

উনার সাথে যোগ দিলেন পরিচারিকা, নার্স আর দাইমা।

সে এক রহস্যময় দৃশ্য! আমার এখনো হুবহু মনে আছে।

সাদা চুলের সেই যাজকের মিষ্টি মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছিলো, একমনে প্রার্থনা করছিলেন তিনি। তিনশো বছরের পুরোনো আসবাবপত্রে ঘেরা সেই পুরোনো, মলিন ঘরের ধুলার গন্ধ... ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে সূর্যের অল্প একটু আলো প্রবেশ করে কেমন যেন রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। আলো-ছায়া ঘেরা সেই ঘরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছিলেন সেই ধর্মযাজক আর তিন নারীমূর্তি... ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো তাদের গলার জোর... তারপর? তারপর কী হয়েছিলো তা আর মনে নেই, অনেক চেষ্টা করেছি মনে করার... কিন্তু লাভ হয়নি।

কিন্তু যে ঘটনাগুলো লিখলাম, এগুলো হয়তো কোনোদিনই ভুলবো না। যেন ভয়ংকর কোনো দুঃস্বপ্নের কিছু অংশ আমার মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে আর বাকিটুকু হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে।

মনের গহীনের আঁধার ঘেরা প্রাঙ্গণে কিছু অপার্থিব ছায়ামূর্তি হয়তো বারবার ফিরে আসে... কিন্তু কেন? উত্তরটা আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক রহস্যময় অতিথি



এখন যে ঘটনা বলবো সেটা এতটাই অদ্ভুত যে বিশ্বাস করার জন্য আমার ওপর আপনাদের অগাধ বিশ্বাস থাকতে হবে। দয়া করে আস্থা রাখুন, যা বলব তার একটি কণাও মিথ্যা নয়। এই অবিশ্বাস্য গল্পের এক চাক্ষুষ সাক্ষী আমি।

তখন গ্রীষ্মকাল চলছিলো, এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো বেশ মনোরম হয়। পুরো আকাশ কেমন যেন লালচে আভাতে ভরে যায়, পাখিরা ঘরে ফেরে, মাঝে মাঝে একটা-দুটো গাড়ি যায় আমাদের প্রাসাদের সামনে দিয়ে। বাবা প্রায়ই বনের মধ্যে হাঁটতে বের হন, আমাকেও ডাকেন। শরীর ভালো থাকলে 'না' করি না। বনের মধ্যে হাঁটতে ভালোই লাগে।

তো তেমনই এক সুন্দর সন্ধ্যায় উনি বললেন, "চলো, একটু ঘুরে আসি।"

চুপচাপ খানিকটা পথ হেঁটে চললাম আমরা।

"বুঝলে, জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের কাল আসার কথা ছিলো আমাদের এখানে, তাই না?" আকাশের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন বাবা, "উনার আসা হচ্ছে না।"

"ওমা, তাই?" অবাক হলাম আমি।

"আসবেন, তবে খানিকটা দেরি হবে।"

মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বেশ ক-সপ্তাহ ধরেই জেনারেল আমাদের এখানে বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করছিলেন। কাল উনার আসার কথা ছিলো। বেশ খুশি ছিলাম মনে মনে, কারণ এবার সাথে করে উনার ভাতিঝি রাইনফেল্টকে (মেয়েটা উনার কাছেই থাকত, সম্ভবত ওর মা-বাবা মারা গেছেন) নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়েটাকে আমি কখনো দেখিনি, তবে শুনেছিলাম ও যেমন সুন্দরী তেমনই মিষ্টি আচার-ব্যবহার। আমারই বয়সি প্রায়।

এমন একটা বান্ধবী পেলে কার না ভালো লাগে? ভেবেছিলাম কয়েকদিন দুটিতে মিলে বেশ মজা করে কাটাবো। কী কী করবো, কোথায় কোথায় ঘুরবো সব ঠিক করে রেখেছিলাম।

কিন্তু কী লাভ হলো? ধুর!

এসব ব্যাপার শহুরে মেয়েরা বুঝবে না। ওদের অনেক বান্ধবী, চাইলেই ঘুরতে পারে। কিন্তু আমার মতো এক নির্জন প্রাসাদবাসিনীর কাছে কয়েকদিনের জন্য সমবয়সি একটা মেয়ের সান্নিধ্য পাওয়াটা অনেক বড় ব্যাপার।

"হুম, তা উনি আসবেন কবে?" গম্ভীর কণ্ঠে বললাম।

"সামনের শরতের আগে তো অবশ্যই না। তার মানে অন্তত দুইমাস দেরি হচ্ছেই।" বললেন বাবা, "তবে মাদামোয়াজেল রাইনফেল্টের সাথে তোমার দেখা হলো না... সেটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে* ।"

"কেন?" কিছুটা অবাক আর অনেকখানি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

"কারণ বেচারি মেয়েটা মারা গেছে," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা, "তোমাকে বলাই হয়নি, ভুলে গেছিলাম আসলে। সন্ধ্যার একটু আগে জেনারেলের চিঠি এসেছে, খবরটা জানাতে তোমার ঘরে গেছিলাম কিন্তু... তুমি ছিলে না।"

খবর শুনে আমি এমন ধাক্কা খেলাম যে বলার মতো না। ছয়-সাত সপ্তাহ আগে লেখা একটি চিঠিতে জেনারেল জানিয়েছিলেন যে মেয়েটার শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু সেই চিঠিতে এমন কোনো ইঙ্গিত ছিলো না যাতে মনে হয় যে মেয়েটার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। হাসি-খুশি মেয়েটা নাকি কেমন যেন বদলে যাচ্ছিলো। ডাক্তার হাওয়া বদলের পরামর্শ দিয়েছেন। সেজন্যই মূলত ওকে আমাদের এখানে বেড়াতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা।

কী থেকে কী হয়ে গেল! সামান্য শরীর খারাপ থেকে মেয়েটা মরেই গেল? ভাবা যায়?

"এই যে জেনারেলের চিঠি," পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিলেন বাবা, "খুবই ভেঙে পড়েছেন ভদ্রলোক। চিঠিটা পড়লেই বোঝা যায়। আহারে লোকটা!"

কিছুটা এগিয়ে গিয়েই একসারি বাতাবিলেবুর গাছ, ওগুলোর মধ্যে একটার নিচে পাথরের তৈরি এবড়ো-থেবড়ো আসনে বসে পড়লাম আমরা। অস্তগামী সূর্যের ছটা যেন দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, বিষাদের রঙে ভরে গেছে পুরো আকাশ। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলস্রোত, সেতুর তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে, দুপাশে অনেক গাছের সারি। আকাশের ফুটে ওঠা বিষণ্নতার প্রভাবে রক্তলাল হয়ে গেছে সেই পানি। জেনারেলের চিঠিটা বেশ অদ্ভুত... আক্রোশে পরিপূর্ণ আর অসংলগ্ন কথাবার্তা... কিছু জায়গায় কথাগুলো

---

* ইংরেজদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত একটি উদ্ভট কুসংস্কার যে, মৃত্যুপথযাত্রী কোনো মানুষের সাথে দেখা হলে অমঙ্গল হয়।

এমন পরস্পরবিরোধী যে দুবার করে পড়তে হলো। দ্বিতীয়বার বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরেই পড়লাম। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হলো না। শেষপর্যন্ত আমরা বাবা মেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ভাতিঝিকে হারিয়ে শোকের ঘোরেই এসব লিখেছেন তিনি।

যাইহোক, চিঠিটাতে লেখা ছিলো–

"আমার মেয়েটা আর নেই! হ্যাঁ, ও আমার নিজের মেয়ে!* ওকে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম। গত কয়েকদিন প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলো আমার বার্থা*, তাই আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি।

"কখনো ভাবিনি এভাবে ওকে হারাতে হবে। কিন্তু এখন... এখন আর নেই আমার সোনা মেয়েটা... আমি সব জানি! জানি ওর কী হয়েছিলো! কিন্তু তাতে আর কোনো লাভ নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে আমার মেয়েটা... কী দোষ ছিলো ওর? মৃত মুখটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে আমার। আহা, কতই না নিষ্পাপ লাগছিলো আমার বাচ্চা মেয়েটাকে... মৃত্যু ওকে মুক্তি দিয়েছে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা থেকে। এক শয়তান পিশাচের লালসার শিকার হয়েছে ও, হে ঈশ্বর! আমাদের ভরসা আর আতিথেয়তার চরম অবমাননা করেছে ওই পাপিষ্ঠ সত্তা! আর আমি কী ভেবেছিলাম? এক অসহায়কে আশ্রয় দিয়েছি বাড়িতে... যে আমার বার্থার নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। ওর মিষ্টি হাসিতে ভয়ংকর ধোঁকা খেয়েছি আমরা সবাই... ভেবেছি সে নিষ্পাপ আর আমুদে... স্বর্গের সব পবিত্র আত্মাদের কসম! কতই না বোকা আমি!

"কে জানতো ওই পিশাচ এমন বেইমানি করবে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বার্থা ওর আসল রূপের কথা না জেনেই মারা গেছে। ও জানেনি, ওর মৃত্যুর জন্য এমন একজন দায়ী যাকে ও বন্ধু ভেবেছিলো। ঈশ্বরের অভিশাপ পড়ুক ওই পিশাচের ওপর। তবে আমি থেমে থাকবো না, যে করেই হোক, ওই দানবকে আমি খুঁজে বের করবোই... তারপর নিজ হাতে হত্যা করবো। কাজটা কঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব না। এই নিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে

---

* মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন জেনারেল, তাই 'মেয়ে' লিখেছেন। আসলে মারা যাওয়া মেয়েটা তার ভাতিঝি, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে।

* মাদামোয়াজেল রাইনফেল্টের ডাকনাম বার্থা।

ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। প্রাসাদের আশেপাশের এলাকাতে অনেক খুঁজেছি... কিন্তু পাইনি! সম্ভবত দেরি করে ফেলেছি আর সেই সুযোগে দূরে পালিয়ে গেছে ও। ওকে এই অঞ্চলে পাবার আর কোনো আশা নেই। ধিক্কার আমাকে... কেন এভাবে মানুষকে বিশ্বাস করি? কেন যাকে-তাকে সাহায্য করি? ইশশশ... কেন সেদিন আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম? যাইহোক আর বেশি কিছু না লিখি, মানসিক অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে আমার। সামলে ওঠার জন্য কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার... তারপর আবার ওর খোঁজে নামবো। সেজন্য হয়তো আমাকে সুদূর ভিয়েনাতেও যেতে হতে পারে।

"আপনার ওখানে যাওয়ার কথা ছিলো, তাই না? আমার মেয়েটাকে নিয়ে? হে ঈশ্বর! তা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। যাইহোক বন্ধু, যদি বেঁচে থাকি তবে দুইমাস পর, মানে শরৎকালে আপনার সাথে দেখা করবো। তার আগেও আসতে পারি... কে জানে?

"তখন আপনাকে সবকিছু খুলে বলবো, যদি অনুমতি দেন আরকি। যে রহস্য আমি জেনেছি তা বড়ই ভয়ংকর, কাগজে ওসব লিখতে সাহস হচ্ছে না।

"এইতো, আর কিছু বলার নেই। আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন বন্ধু।"

এভাবেই শেষ হয়েছে অদ্ভুত (এবং একই সাথে হৃদয়বিদারক) চিঠিটা। বার্থা রাইফেল্টকে কখনো চোখে দেখিনি, কখনো দেখাও হবে না... তারপরেও নিজের অজান্তেই চোখে পানি চলে এলো। কী এমন হয়েছিলো মেয়েটার? জেনারেল এসব অদ্ভুত কথা কেন লিখেছেন?

অদ্ভুত এক হতাশা গ্রাস করলো আমায়। মানুষের জীবন বড়ই রহস্যময়, কখন যে কী হয়, কে জানে? কদিন আগেও যে মেয়েটার সাথে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করছিলাম, আজ সে অতীত!

সূর্য ডুবে গেছে। গোধূলির মোলায়েম আলোতে রহস্যময় দেখাচ্ছে গাছগুলো। চিঠিটা ফেরত দিলাম বাবাকে।

ফিরতি পথ ধরলাম আমরা। বাবাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক লাগছিলো।

একটু এগিয়ে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই। চিঠিটার কথা মন থেকে যাচ্ছিলোই না। কী পড়লাম এসব? কে এসেছিলো জেনারেলের বাড়িতে? কে মেয়েটার মৃত্যুর জন্য দায়ী? নাকি প্রচণ্ড মানসিক

চাপের কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে ভদ্রলোকের?

হেঁটে চললাম আমরা দুজন, প্রায় এক মাইল রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছলাম বাড়ির সামনের সেই সরু রাস্তাটার কাছাকাছি। ততক্ষণে হলুদাভ চাঁদের আলোতে যেন ভেসে যাচ্ছিলো সবকিছু।

টানা সেতুটার কাছাকাছি আসতে দেখতে পেলাম মাদাম পেরোডোন আর মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইনকে। বনেট* না পরেই বেরিয়ে পড়েছেন উনারা। সুন্দর চাঁদের আলো উপভোগ করছেন। এই সুন্দর সন্ধ্যাতে ঘরে বসে থাকতে কারই বা মন চায়?

আরেকটু এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলাম উনাদের কথা। জমিয়ে গল্প করছেন দুজন। আমাদের দেখে হাত নাড়লেন মাদাম পেরোডোন।

"সন্ধ্যাটা সুন্দর, কী বলো?" হাসলেন বাবা।

"একদম স্যার, একদম," হেসে উঠলেন তারা দুজন।

ওদের সাথে গল্পে মেতে উঠলেন বাবা, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের ভেতরটা কেমন যেন খচখচ করছিলো।

উদাস চোখে চেয়ে রইলাম বনের দিকে। বামদিকের সরু রাস্তাটা লম্বা লম্বা গাছের মধ্যে দিয়ে বনের ভেতর মিলিয়ে গেছে, তারপর খানিকটা সামনে গিয়ে পাক খেয়ে মিশেছে বনের ভেতরের সেই সেতুটাতে। ওই সেতুটার কাছে একটা মিনারের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এককালে না-কি ওখানে অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের সেনারা পাহারা দিত। সেতুর ওপাশে খানিকটা দূরে উঁচু পাহাড়ের সারি, নিচের দিকে অজস্র গাছ। প্রচুর পাথরে ভরতি সেই জমিটা, পাথরগুলো ঢেকে আছে আইভি লতায়।

পাতলা কুয়াশার একটা আবরণ ধোঁয়ার মতো চুপিসারে এগিয়ে আসছিলো বনের মধ্যে দিয়ে, যেন প্রকৃতি সযত্নে ঢেকে দিচ্ছে নিজের অপার্থিব রহস্যগুলোকে।

প্রাসাদের সামনের একটা উঁচু বেদির ওপর দাঁড়ালেই নদীটা দেখা যায়। নিজের অজান্তেই উঠে গেলাম ওটাতে... আহা... চাঁদের আলোতে ঝিকমিক

* শিরাবরণ, পুরো ইউরোপেই মধ্যযুগে নারীরা ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মাথা ঢাকার জন্য এটা ব্যবহার করতেন। অষ্টাদশ দশকে পশ্চিম ইউরোপে অভিজাত মহিলারা পরা শুরু করেন হ্যাট আর সাধারণ ঘরের মহিলারা বনেট, কিন্তু পূর্ব ইউরোপে প্রায় সব মহিলাই বনেট পরতেন।

করছে নদীর পানি।

এমন মনোরম দৃশ্য কল্পনার অতীত! পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ চিত্রশিল্পীও মনে হয় এই দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। কিছুক্ষণের জন্য যেন ভুলে গেলাম সেই চিঠির কথা... আশপাশের সবকিছুর কথা। যেন এক টুকরো স্বর্গ নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে! যেন ওখানেই নিহিত আছে চিরশান্তি, প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলার মধ্যে যদি হারিয়ে যেতে পারতাম... কিন্তু ঈশ্বর সেই ক্ষমতা দেননি আমায়... কোনো মানুষকেই দেননি।

হায় ঈশ্বর! কেন আমরা এত অসহায়?

কখন যে বাবা এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেই পারিনি। আমার কাঁধে হাত রেখে মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। দুজনেই চেয়ে রইলাম নদীর সেই রহস্যময় জলধারার দিকে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দুই আয়া তখনো গল্প করছেন। যতটুকু বুঝলাম চাঁদ নিয়ে নানান কথা বলছেন উনারা।

খানিকটা সরে দাঁড়ালাম, হ্যাঁ এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি উনাদের কথা।

মাদাম পেরোডোন মধ্যবয়স্ক হলেও উনার মনে তারুণ্যের আমেজ এখনো স্পষ্ট, হেলে-দুলে একটা প্রেমের কবিতাও বলে ফেললেন উনি, চাঁদের আলো যেন এক অদ্ভুত কাব্যিক ছন্দ এনে দিয়েছে উনার মোটা শরীরটায়। কিন্তু মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইনকে খানিকটা গম্ভীর লাগছে, উনার বাবা ছিলেন একজন জার্মান। জার্মানদের চিরকালই কেমন যেন গম্ভীর লাগে আমার। যাইহোক ভদ্রলোক নাকি মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মধ্যযুগীয় অতিপ্রাকৃত বিদ্যাতে বেশ ভালোই জ্ঞান রাখতেন।

কেমন যেন থমথমে গলায় উনি বলতে লাগলেন, "চাঁদের এই কিরণ সবসময় যে ভালো কিছু ইঙ্গিত করে তা কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে এর মাধ্যমেই ভেসে আসে পারলৌকিক কিছু সংকেত... পূর্ণচন্দ্রের আলোর প্রভাব অনেক। জানেন, মাঝে মাঝে উন্মাদেরা চাঁদের আলোয় অস্থির হয়ে ওঠে? অদ্ভুত সব আচরণ করে... দুর্বলচিত্তের লোকেরা দেখে উদ্ভট সব স্বপ্ন! অনেককেই দেখেছি যারা পূর্ণচন্দ্রকে ভয় পায়... এই আলোতে না-কি অতিপ্রাকৃত জীবেরা নিজেদের দৈহিক আকৃতি পরিবর্তনের শক্তি পায়।"

"কী বলছো এসব?" বিরক্ত হলেন মাদার পেরোডোন।

"শুনুন, আমার চাচাতো ভাইয়ের ঘটনা বলি। একটা বাণিজ্যিক জাহাজে

খালাসির কাজ করত সে। এমনই এক চাঁদনি রাতে ডেকের ওপর চিত হয়ে ঘুমাচ্ছিলো... ওর মুখটা ছিলো একদম চাঁদ বরাবর... হুট করে ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে সে! স্বপ্নের মধ্যে এক ভয়ংকর চেহারার বুড়ি না-কি ওর গাল খামচে ধরেছিলো, ও ছাড়াতে গেলে বুড়ি ওর ঘাড়টা চেপে ধরে! ঘুম থেকে ওঠার পর ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগে ওর, তারপর বুঝতে পারে যে ঘাড়টা খানিক বেঁকে গেছে... অনেক কষ্ট করেও সোজা করতে পারলো না... বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলো সে। জড়ো হলো জাহাজের নাবিকেরা। ওর কাহিনি শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল... শুধু একজন বুড়ো নাবিক বলেছিলো, 'চাঁদের দিকে মুখ করে ঘুমাতে হয় না!*' ওর ঘাড়টা এখনো অমনই আছে, আর কখনোই ঠিক হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েও লাভ হয়নি।"

"এমা, সত্যিই এমন হয় না-কি? যাহ!"

"আপনি বিশ্বাস না করলেও কিছুই যায় আসে না, চাঁদের আলোয় এক অদ্ভুত সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। অশুভ এক প্রভাব... কবিরা শুধুই চাঁদের মনোরম রূপ দেখে কবিতা লেখেন, উনারা তো আর জানেন না আলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা আঁধারের রহস্যের কথা। পিছনে তাকান, ওই অশুভ আলোয় কেমন রহস্যময় লাগছে আমাদের প্রাসাদকে... মনে হচ্ছে প্রতিটি জানালা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে... যেন অশুভ প্রেতের দল অপেক্ষা করছে ভেতরে..."

কেমন যেন ঘোর লেগে গেছিলো আমার, চুপচাপ শুনছিলাম উনাদের কথাগুলো। এরাও দেখি জেনারেলের মতো অপার্থিব ব্যাপার-স্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করছেন। এই যুগে কেউ ওসব বিশ্বাস করে? একবার ভাবলাম বলেই ফেলি, কিন্তু কোনো এক অজানা শক্তি যেন আটকে রাখলো আমায়। ছোটবেলার সেই ঘটনাটা মনে পড়লো। অনেক কিছুই আছে যা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। স্থির দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে উনাদের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলাম।

---

* মধ্যযুগে অনেক জার্মানরাই মনে করত চাঁদে অপদেবতাদের বাস, তাই খোলা মাঠে ঘুমালে তারা কখনো চাঁদের দিকে তাকাত না।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম মনে নেই।

"মনটা খুব খারাপ লাগছে বুঝলে," বলে উঠলেন বাবা, "কিছুই ভালো লাগছে না।"

বাবার কণ্ঠ শুনে চুপ মেরে গেল দুই আয়া। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

তারপর আনমনেই বাবা শেকসপিয়রের লেখা কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন–

"সত্যি বলছি জানি না কেন আমার মন খারাপ,
আমি ক্লান্ত, বেজায় ক্লান্ত – তোমরা বলছো, তোমরাও ক্লান্ত,
কিন্তু কেন এই ক্লান্তি? কেন এই হতাশা গ্রাস করলো আমাদের?"

বাড়িতে শেকসপিয়রের বেশ কয়েকটা বই আছে। আমি মাঝে মাঝেই পড়ি। আরো অনেক ইংরেজি বই-ই আছে। পাছে আমি ইংরেজি ভুলে যাই, তাই বাবা ওসব আনিয়ে রেখেছেন।

"তারপর বাবা? পরের লাইনগুলো?" মৃদু হাসলাম আমি।

"মনে পড়ছে না রে। কেন যেন মনে হচ্ছে বেজায় খারাপ কিছু একটা ঘটছে চলছে... কোনো ভয়ানক বিপদের ছায়া গ্রাস করতে চলেছে আমাদের। বেচারা জেনারেল... উনার চিঠিটা পড়েই হয়তো মনের এই অবস্থা।"

ঠিক তখনই খুব কাছ থেকে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম, তারপরেই ঘোড়ার খুর আর গাড়ির চাকার শব্দ। চমকে উঠলাম আমরা, এত রাতে কে আসছে?

মনে হচ্ছিলো বনের ভেতরের সেই সেতুটার ওপাশের উঁচু জায়গাটা থেকে আসছে সেই শব্দ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে বেশ ভালোই দেখা যায় সেতুটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতুর ওপর আবির্ভূত হলো একটা দল। প্রথমে দুজন ঘোড়সওয়ার পার হলো, তারপর দেখতে পেলাম চার ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি, তারপর আবার দুজন ঘোড়সওয়ার।

চাঁদের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম গাড়িটা। এমন দামি গাড়ি এই অঞ্চলে খুব কমই আছে। সন্দেহ নেই ওটার মালিক কোনো অভিজাত পরিবারই হবে। অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম আমরা। গাড়িটা সেতুর মাঝখানে আসতেই আগে সেতু পেরিয়ে যাওয়া দুজন ঘোড়সওয়ারের একজন

কোনো কারণে আর্তনাদ করে উঠলো, তাতে বিগড়ে গেল গাড়ির ঘোড়াগুলো। প্রচণ্ড জোরে এগিয়ে আসতে লাগলো তারা, ছিটকে গেল সামনের দুজন ঘোড়সওয়ার।

তুফান বেগে আমাদের প্রাসাদের দিকে আসছে লাগলো গাড়িটা!

গাড়ির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিলো। সম্ভবত ভেতরে থাকা কোনো মহিলার আঘাত লেগেছে। যে জোরে এসেছে ঘোড়াদুটো! গাড়িটা যে উলটে পড়েনি সেটাই অনেক।

চমকে উঠলেন আমাদের দুজন আয়া। "অমঙ্গল, ঘোর অমঙ্গল," আনমনেই বলে উঠলেন মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইন। চুপচাপ বেদিটা থেকে নেমে সরু রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন বাবা, উনার পিছে পিছে আমরা তিনজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের একদম কাছাকাছি চলে এলো গাড়িটা। এরপরেই ঘটলো আরো অদ্ভুত এক ঘটনা। প্রাসাদের টানা সেতুটার একটু আগে রাস্তার পাশে বেশ লম্বা একটা বাতাবিলেবুর গাছ, তার ঠিক বিপরীতেই পাথরের তৈরি একটা মাঝারি আকারের ক্রুশচিহ্ন। সেটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল ঘোড়াগুলো... এমনভাবে ঘুরে গেল ওরা, যে গাড়ির চাকা ধাক্কা খেলো একটা বেশ বড় গাছের গুঁড়ির সাথে।

হে ঈশ্বর! প্রচণ্ড ভয়ে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললাম। চিৎকার করে উঠলেন মাদাম পেরোডোন আর মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইন।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপরেই শুনতে পেলাম কয়েকটা অচেনা কণ্ঠ।

কৌতূহলের বশে নিজের অজান্তেই খুলে গেল আমার চোখদুটো। সে এক ভয়াবহ অবস্থা, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুটো ঘোড়া, গাড়িটা আটকে গেছে রীতিমতো। খানিকটা উঁচু হয়ে আছে ওটার পিছন দিকটা, সেখানের চাকাগুলো এখনো ঘুরছে। সেই চারজন ঘোড়সওয়ারের মধ্যে দুজন গাড়িটাকে সোজা করার চেষ্টায় ব্যস্ত আর বাকি দুজন রাস্তায় ফুটে ওঠা চাকার দাগের ওপর ঘোড়া চালিয়ে তা মুছে দিচ্ছে*!

অদ্ভুত ব্যাপার! চাকার দাগ মুছে দেওয়ার কী আছে?

---

* পূর্ব ইউরোপে মধ্যযুগে অশ্ববাহী গাড়িগুলোর চাকার দাগের ওপর ঘোড়া চালিয়ে তা বিকৃত করা ছিলো রণকৌশলের অংশ। এখানে কেন এই কাজ করা হয়েছে তা পরে বুঝতে পারবেন পাঠকেরা।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা। রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মুছছেন তিনি। পরনে জমকালো পোশাক, মাথায় দামি হ্যাট। দেখেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ তিনি।

গাড়ির বামদিকের দরজাটা খুলে একজন তরুণীকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো একজন ঘোড়সওয়ার। ভালো করে দেখলাম মেয়েটাকে, একদমই নড়ছে-চড়ছে না! মারা গেছে না-কি?

বাবা ইতোমধ্যেই মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

"একদম ভয় পাবেন না মাদাম, আমার প্রাসাদে কোনো-কিছুর কমতি নেই। আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করতে চেষ্টা করবো," হ্যাট খুলে বললেন তিনি।

মহিলা উনার কথা শুনেছেন বলে মনে হলো না। একদৃষ্টিতে সেই মেয়েটার দিকে চেয়ে রয়েছেন তিনি। টানা সেতুর সামনে মেয়েটাকে শুইয়ে দিলো ঘোড়সওয়ার, বেশ রোগা ও।

কাছে এগিয়ে গেলাম, মেয়েটা সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু মারা যায়নি। ডাক্তার না হলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে বেশ ভালোই জ্ঞান ছিলো বাবার। প্রাসাদের সবার ছোটখাটো চিকিৎসা উনিই করতেন। মেয়েটির হাতের কবজি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

"আমার মেয়ে, কী হলো ওর?" বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা। কণ্ঠে বেশ কর্তৃত্বের একটা ভাব আছে উনার।

"ভয়ের কিছু নেই মাদাম, নাড়ির স্পন্দন কিছুটা ধীর এবং অনিয়মিত... তবে স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে আপনার মেয়ে।"

ভদ্রমহিলা হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বাবার মুখের দিকে তাকালেন, সেই দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু পরক্ষণেই চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

কেমন যেন মেকি লাগলো আমার কাছে সেই কান্না, ঠিক যেভাবে মঞ্চনাটকের নায়িকারা কাঁদে। পরক্ষণেই লজ্জিত হলাম, এসব কী ভাবছি? মহিলার মেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে, উনার কান্না কেন মেকি হবে?

"মাদাম, সামলান নিজেকে," উনার হাত ধরলেন বাবা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনাকে দেখতে লাগলাম। সন্দেহ নেই, যৌবনে অপূর্ব রূপসী ছিলেন তিনি, এখনো চেহারায় ধারালো ভাব স্পষ্ট। বেশ লম্বা, তবে মেয়ের মতো রোগা নন। পরনের পোশাকটা কালো মখমলের তৈরি, মুখটা

কেমন যেন ফ্যাকাশে... চলন বলনে গর্ব আর আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। বর্তমানে খানিকটা বিচলিত হলেও বোঝা যায়, উনি হুকুম করে অভ্যস্ত।

কাঁদতে কাঁদতেই আকাশের চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি।

"এ আমি কী বিপদে পড়লাম! আমার জন্মই কি হয়েছে এসব দুর্দশা সহ্য করার জন্য?" আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, "খুবই জরুরি একটা কাজে যাচ্ছিলাম... জীবন-মরণ সমস্যা বলতে পারেন! এক ঘণ্টা সময় নষ্ট মানেই সর্বনাশ! কিন্তু আমার মেয়ে... না জানি ও কবে সুস্থ হবে, কবে আবার হাঁটতে পারবে! আর উপায় নেই... ওকে কোথাও রেখে যেতে হবে। কোনোমতেই দেরি করা চলবে না। স্যার, অনেক উপকার বললেন... আপনার এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। আরেকটা উপকার করুন, দয়া করে বলবেন সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রামটা কত দূরে? ওখানেই ওকে রেখে যাবো। অন্তত তিনমাস ব্যস্ত থাকবো, তারপর আবার ফিরবো... এর মধ্যে ওর খবর নেওয়া একেবারেই সম্ভব না আমার পক্ষে। ওখানেই কোনো সরাইখানার মালিককে আমার সোনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দিতে যেতে হবে... যতদিন না ফিরি।"

বাবার কোট ধরে টান দিলাম, আমার দিকে ঘুরলেন উনি।

"বাবা," উনার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললাম আমি, "মেয়েটাকে আমাদের এখানে রেখে যেতে বলো না... কী ভালোই না হবে, বলো? বলো না বাবা... একবার বলেই দেখ।"

"মাদাম," মহিলার দিকে ঘুরলেন বাবা, "কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি?"

"বলুন স্যার," কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন মহিলা।

"আপনার মেয়েকে আমার প্রাসাদেই রেখে যান। আমার মেয়ের সাথে থাকবে... ওর আয়া ম্যাডাম পেরোডোন দুজনের দেখাশোনা করবেন। আমি কথা দিচ্ছি, ওর কোনো অযত্ন হবে না। যতদিন আপনি না ফেরেন, ওর দায়িত্ব আমি নিলাম। আমাদের এই ছোট্ট প্রাসাদে ওর দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে।"

"না না স্যার," চোখ মুছলেন মহিলা, "ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। এমনিতেই কত কিছু করলেন আমাদের জন্য। আপনার ওপর শুধু শুধু একটা বোঝা চাপিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।"

"আরে ছি ছি! বোঝা কেন বলছেন? ও তো আমারই মেয়ের মতো। এই

বিপদের সময়ে আপনার পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য, আর তাছাড়া এর পিছনে আমার একটা বেশ বড় স্বার্থও আছে!"

"স্বার্থ? কী স্বার্থ?" ভ্রু কুঁচকে গেল মহিলার।

"এই যে আমার মেয়ে," আমাকে দেখালেন বাবা, "আমার এক বন্ধুর তার ভাতিঝিকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসার কথা ছিলো। মেয়েটা আমার মেয়েরই বয়সি। খুব উৎসুক ছিলো আমার বাছা, ওই মেয়েটার সাথে কোথায় কোথায় ঘুরবে সেসবও ঠিক করে রেখেছিলো। কিন্তু সন্ধ্যায় খবর এলো উনারা আসছেন না। সেই থেকে ওর মনটা খুব খারাপ। বোঝেনই তো, এত বিশাল দুর্গে একা থাকে বেচারি। একজন সঙ্গী পেলে ভালোই হয়। আপনার মেয়েটাকে যদি রেখে যান, তবে ও খুব খুশি হবে। আর তাছাড়া সবচেয়ে কাছে যে গ্রামটা সেটাও অনেক দূরে, ওখানকার বাসিন্দারাও সবাই বেশ গরিব; আপনার মেয়েকে রেখে যাওয়ার মতো ভালো পান্থশালা পাবেন না। আর এই অবস্থায় ওকে অতদূর টেনে নিয়ে যাওয়ারও কোনো মানে হয় না।"

'তারপরেও স্যার..." আমতা-আমতা করতে লাগলেন মহিলা।

"দেখুন মাদাম, যেহেতু আপনি বলছেন জরুরি কাজটাতে আপনাকে যেতেই হবে... ওকে এখানেই রেখে যান। এটাই ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।"

ওদিকে আমি মহিলাকে দেখছি। মহিলার চেহারা, চালচলন বেশ কর্তৃত্বব্যাঞ্জক, কথাগুলোও বেশ মাপা-মাপা। মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার বেশ ভালোই ক্ষমতা আছে। দামি গাড়ি, ঘোড়াগুলোও বেশ ভালো জাতের, অনুচরদের পোশাকগুলোও অনেক মূল্যবান... উনি যে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এর মধ্যেই গাড়িটাতে সোজা করে ফেলেছে উনার অনুচরেরা। ঘোড়াগুলোকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে আগের মতন।

মহিলা অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকালেন মাটিতে শুয়ে থাকা নিজের মেয়ের দিকে। অমন দৃষ্টি,.. আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না... মানে ওটা কোনো মায়ের স্নেহমাখা চাহনি হতে পারে না! কেমন যেন অদ্ভুত ধূর্ততা মিশে ছিলো সেই নজরে। একটু এগিয়ে গিয়ে বাবাকে ইশারা করলেন তিনি, বাবা উনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাবার চোখে চোখ রেখে কীসব যেন বলতে লাগলেন তিনি। উনার মুখটা কেমন যেন কঠোর হয়ে গেছে।

আজব ব্যাপার, একটু আগেই না উনি কাঁদছিলেন? মহিলার চাহনিতে

কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা ভাব আছে। বাবার কি অস্বস্তি লাগছে না? উনি কি একদমই খেয়াল করেননি হুট করেই মহিলার আচরণ বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা?

উনি কথা বলে যাচ্ছেন, বাবা একমনে শুনছেন। এত আস্তে যে আমি একটা শব্দও শুনতে পেলাম না।

দুই-তিন মিনিট পর তিনি ফিরে এলেন মেয়ের কাছে। মাদাম পেরোডোন মেয়েটার মাথাটা কোলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। নিচু হয়ে মেয়ের কানে কানে কীসব যেন বললেন মহিলা। তারপর কপালে চুমু খেয়ে নিমিষেই উঠে গেলেন গাড়িতে। দরজাটা বন্ধ করে দিলো একজন অনুচর। গাড়িতে উঠে বসলো কোচোয়ান, ঘোড়া নিয়ে গাড়ির সামনে আর পিছনে দাঁড়ালো অনুচরেরা, ঠিক যেভাবে ওরা এসেছিলো।

পরে মাদাম পেরোডোনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মহিলা তার মেয়ের কানে কানে কী বললেন? উনি বললেন, "আমিও স্পষ্ট করে শুনতে পাইনি গো, যতোদূর মনে হলো, মহিলা নিজের মেয়েকে আশীর্বাদ করলেন।"

যাইহোক, পেছনের দুজন ঘোড়সওয়ার পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতা মারলো, প্রায় সাথে সাথেই চমকে উঠলো কোচোয়ানের চাবুক। বিদ্যুদ্‌বেগে চলতে শুরু করলো গাড়িটা, আগেরবার সামনে থাকা ঘোড়াদুটো চলতে লাগলো গাড়ির দুপাশে। পেছনের ঘোড়াদুটোও অনুসরণ করতে লাগলো ওদের।

বারবার ভয়ার্ত চোখে ক্রুশচিহ্নটার দিকে তাকাচ্ছিলো ঘোড়াগুলো।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি ভেবেছিলাম মহিলা অন্তত একবার হলেও আমাদের সাথে প্রাসাদের ভেতরে যাবেন। যাইহোক, উনার তাড়াহুড়া আছে, কী আর বলবো?

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ আলাদা, কিন্তু স্বপ্ন এক!



প্রাসাদ থেকে দূরে সরতে লাগলো সেই গাড়ি আর ঘোড়সওয়ারেরা। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওদিকে, ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সেই দলটা। ঘোড়ার খুর আর চাকার শব্দ যেন বিলীন হয়ে গেল অন্ধকার রাতের বুকে।

সে এক অদ্ভুত অনুভূতি, কেন যেন মনে হচ্ছিলো এতক্ষণ যা ঘটেছে সব মিথ্যা! কিছুই হয়নি... সব ধোঁকা!

আমার মনে এসব চিন্তা কেন এলো? কেন ওসব মিথ্যা হবে? ওইতো মেয়েটা এখনো শুয়ে আছে।

"চোখ খুলেছে," বলে উঠলেন মাদাম পেরোডোন। মেয়েটা অন্যদিকে মুখ করে ছিলো, তাই ওর চেহারাটা দেখতে পেলাম না।

মাথা তুলে এদিক-সেদিক দেখতে লাগলো মেয়েটা। অপূর্ব সুন্দরী মায়াকারা চেহারা।

"মা কোথায়?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো সে। আহা, কী যে মিষ্টি গলা মেয়েটার!

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহভরা কণ্ঠে মাদাম পেরোডোন সব বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমি।

"আমি কোথায়, এটা কোন জায়গা?" মাদামের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো মেয়েটা, "আমাদের গাড়িটা কোথায়? মাসতকা*... ওর কী হয়েছে?"

মাদাম আস্তে আস্তে ওকে সব খুলে বলতে লাগলেন। চুপচাপ শুনে গেল মেয়েটি। ধীরে ধীরে ওর মনে পড়লো সেই দুর্ঘটনার কথা। যখন সে জানলো যে ওতে কেউই তেমন হতাহত হয়নি, বেশ সুন্দর হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখটা।

একদম শেষে গিয়ে মাদাম জানালেন যে ওর মা তিন মাসে বাদে ফিরবেন।

"তিনমাস! এতদিন মাকে ছাড়া থাকবো?" হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে

---

* গাড়ির মধ্যে তৃতীয় যে নারী ছিলো তার নাম সম্ভবত এটি। কারমিল্লার সাথে তার কী সম্পর্ক তা কখনোই পরিষ্কার করেননি লেখক। পাঠক একটু পরেই জানতে পারবেন তার কথা।

কেঁদে উঠলো মেয়েটা।

আহারে মেয়েটা, ওর সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইন, আমার হাতটা ধরে বললেন, "এখন তুমি যেও না, মাদাম তো আছেনই। তাছাড়া মেয়েটার কেবল জ্ঞান ফিরেছে, এসময়ে ওর সাথে একজনেরই কথা বলা ভালো। তুমি ছোট মানুষ, কী বলতে কী বলবে... যদি ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে? ব্যাপারটা ভালো হবে না। আরেকটু ধাতস্থ হোক তারপর কথা বলতে যেও।"

"সেটাই ভালো হবে," মনে মনে ভাবলাম আমি, *"প্রাসাদে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিক ও, তারপর কথা বলবো।"*

ইতোমধ্যেই বাবা একজন চাকরকে ঘোড়ায় করে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার ভদ্রলোকের বাড়ি এখান থেকে প্রায় দুই লিগ দূরে। মেয়েটার জন্য বাড়ির মধ্যে একটা শোবার ঘরেরও বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, তারপর ম্যাডাম পেরোডোনের কাঁধে ভর দিয়ে টানা সেতু পেরিয়ে প্রাসাদে ঢুকলো। হলঘরে দুজন অনুচর অপেক্ষা করছিলো। ওরা মেয়েটাকে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

আমাদের প্রাসাদের ড্রইংরুমটা বেশ সুন্দর। বেশ বড় সেই ঘরের চারটি জানালা দিয়ে পরিখা, টানা সেতু আর বনটা (আগেও আপনাদের বলেছি) বেশ ভালোই দেখা যায়।

ঘরভরতি ওক কাঠের নানা আসবাবপত্র, গথিক ধাঁচের কাজ করা বেশ কয়েকটা দেয়াল-আলমারি, চেয়ারগুলো লালচে রঙের উট্রেখট* মখমলে মোড়া। দেয়ালজুড়ে নানান কারুকার্য, মাঝে মাঝে বেশ বড় সোনালি কিছু চতুর্ভুজ, অনেকটা ছবির ফ্রেমের মতো। সেই ফ্রেমের ভেতর মানুষ আর পশুপাখির প্রমাণ আকৃতির কিছু মূর্তি খোদাই করা। মানুষগুলোর পরনে পুরোনো অদ্ভুত সব পোশাক। একেকটার ছবির বিষয়বস্তু একেক রকম – কোথাও কয়েকটা মানুষ শিকার করছে, কোথাও বাজপাখি কাঁধে নিয়ে

---

* হল্যান্ডের শহর উট্রেখট মধ্যযুগ থেকেই মখমলের জন্য পুরো ইউরোপে বিখ্যাত, অবশ্য আঠার শতক থেকে পুরো হল্যান্ডের মখমলকেই উট্রেখট মখমল বলে ডাকা শুরু হয়। উট্রেখট উচ্চারণটি মূলত ইংরেজ/আইরিশ/স্কটিশরা করে। আমেরিকানরা বলে ইউট্রেখট, আর ওলন্দাজরা বলে ইয়েত্রেক্ত। যেহেতু লেখক আইরিশ, তাই মূল ওলন্দাজ উচ্চারণ ব্যবহার না করে আইরিশ উচ্চারণটিই রাখা হলো।

অভিযানে বেরিয়েছে কোনো বীরপুরুষ, আবার কোথাও কোনো অজানা উৎসবে মেতে আছে একদল মানুষ। বারবার চোখ যায় ওগুলোর দিকে, কেমন যেন অজানা এক অস্বস্তিতে ভরে ওঠে আমার মনটা।

কিন্তু কিছুই করার নেই, এখানে বসেই প্রতি সন্ধ্যায় আমরা চা খাই। চা অত ভালো লাগে না আমার, কফি আর চকলেটই পছন্দ করি। কিন্তু ঐ যে, বাবার দেশপ্রেম! আমরা ইংরেজ, চা না খেলে চলে?

প্রতি সন্ধ্যাতে চা, কফি, চকলেট সবই খাই আমি।

মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসলাম আমি আর বাবা। মোমবাতির আলোতে রহস্যময় লাগছিলো দেয়ালের সেই ছবিগুলো।

"কী একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো, বলো দেখি?" বলে উঠলেন বাবা।

"তা বটে, কিন্তু মেয়েটা আসাতে ভালোই হয়েছে, আমার একাকী ভালো লাগে না," মৃদু হাসলাম।

মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইনও চলে এলেন। মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই না-কি ঘুমিয়ে পড়েছে ও। একজন ভৃত্যকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে এখানে এসেছেন। মাদাম পেরোডানও না-কি আসছেন।

উনার কথা শেষ না হতেই দরজায় দেখা গেল মাদাম পেরোডানকে।

"মেয়েটাকে কেমন লাগলো আপনার মাদাম? ও এখন কেমন আছে?" ঢুকতে না ঢুকতেই উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"বেশ ভালো মেয়ে," হাসলেন মাদাম, "অসম্ভব নম্র আর ভদ্র, বয়স তোমার মতোই। আর একটা কথা জানো? এত সুন্দর মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি!"

"পরমাসুন্দরী যাকে বলে," গলা মেলালেন মাদামোয়াজেল।

"আর কী মিষ্টি কণ্ঠ, শুনলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়," মাথা নাড়লেন মাদাম।

"মেয়েটাকে একটু দেখে এখনই আসছি," ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবা।

"আচ্ছা মাদাম," কেমন যেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মাদামোয়াজেল, "গাড়ির ভেতরে কিন্তু আরেকজন ছিলো জানেন। খেয়াল করেছেন আপনারা? একটা মেয়ে... ছোট্ট জানালাটা দিয়ে বেশ কয়েকবার বাইরে তাকিয়েছে ও... নামলো না কেন ও?"

"না তো, খেয়াল করিনি, এই মেয়েটাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।"

'মেয়েটা সম্ভবত কৃষ্ণাঙ্গ, মাথায় পাগড়ির মতো কী একটা দেওয়া। চেহারাটা বেজায় উদ্ভট, জানালা দিয়ে বারবার দেখছিলো আমাদের... মানে শুধু মেয়েদের। আমি খেয়াল করেছি ও একবারও স্যারের দিকে তাকায়নি। অন্ধকারের রীতিমতো জ্বলজ্বল করছিলো ওর সাদা চোখদুটো... আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছি... ওর চোখের মণিদুটো... সাদা! মানে চোখদুটো পুরোটাই সাদা। কয়েকবার হেসেছেও মেয়েটা... মুখভরতি সাদা ঝকঝকে দাঁত... মাঝে মাঝেই মুখটা কেমন বিকৃত করছিলো সে, যেন এই ঝাপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর... কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে... যাক গিয়ে, ঝোঁকের বশে কী দেখতে কী দেখেছি।"

"জ্ঞান ফেরার পর মেয়েটা ওর মা ছাড়াও আরেকজনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো, এই মেয়েটার কথাই মনে হয়। যাইহোক একটা জিনিস খেয়াল করেছো? ওদের সাথে আসা অনুচরগুলোর চেহারা কেমন উদ্ভট?" বলে উঠলেন মাদাম।

"হুম সেটাই ভাবছি," ঘরে ঢুকলেন বাবা, "চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো লোকগুলো মোটেই সুবিধার না। কেমন যেন কুৎসিত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে শয়তানি স্পষ্ট... এমন চেহারার লোক এই অঞ্চলে আগে দেখিনি। মহিলা এদের কেন কাজে রেখেছেন? এখন তো ভয় হচ্ছে, জঙ্গল পেরোতে বেশ অনেকটা সময় লাগবে ওদের। নির্জন কোনো জায়গাতে যদি মহিলার কোনো ক্ষতি করে ওরা? আজকাল তো ডাকাতি এমনিতেই বেড়ে গেছে। একেক জনের চেহারা তো দাগী আসামির মতো... খুব অল্প সময়েই সবকিছু করে ফেলতে পারবে ওরা... আর ওই জঙ্গলে মহিলার চিৎকারও কেউ শুনতে পাবে না! হে ঈশ্বর! রক্ষা করুন..."

"আমার মনে হয় না এমন কিছু হবে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন মাদাম, "দীর্ঘ ভ্রমণে লোকগুলোকে বেজায় ক্লান্ত লাগছিলো, আর তাছাড়া... ওরা কেউই তেমন সুঠামদেহী নয়, কেমন যেন গম্ভীর আর রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে চেহারা... হ্যাঁ, আমারও ওদেরকে সুবিধার লোক মনে হয়নি। কিন্তু মনে হয় না ব্যাটারা ডাকাত। লোকগুলো কবে থেকে চাকরিতে বহাল হয়েছে, কে জানে? মেয়েটার জ্ঞান ফিরুক, তারপর ওর কাছ থেকে সব শোনা যাবে।"

"আমার মনে হয় না ও তেমন কিছু বলবে," মাথা নাড়লেন বাবা, রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছে উনার মুখে। উনি কি কিছু লুকাচ্ছেন?

ওই কালো মখমলের পোশাক পরিহিতা মহিলার সাথে উনার কী কথা হয়েছিলো? ব্যাপারটা শুরু থেকেই খুব একটা পছন্দ করিনি আমি। বাবাকে দূরে ডেকে নিয়ে একা একা কথা বলার কী দরকার ছিলো? আমাদের সামনে বললে হতো না? আমরাও শুনতাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেলেন মাদাম আর মাদামোয়াজেল।

"বাবা, ওই মহিলা তোমাকে একাকী ডেকে কী বলেছিলেন?" বাবাকে একা পেয়ে প্রশ্নটা করেই বসলাম।

"এখনই শুনবে?" একটু যেন বিরক্ত হলেন বাবা।

"হুম।"

"আচ্ছা বলছি দাঁড়াও," আমার পাশে এসে বসলেন উনি।

রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। এত সহজেই উনি আমাকে ব্যাপারটা বলতে রাজি হয়ে যাবেন আশা করিনি!

"আসলে গোপন করার মতো কিছু না," একটু কাশলেন তিনি, "তিনি বললেন তার মেয়েকে নিয়ে বেশি চিন্তা না করতে, ওর বেশি খেয়াল রাখারও দরকার নেই। ওকে যে আমরা রাখছি এতেই উনি কৃতজ্ঞ। মেয়েটা একটু দুর্বল আর খানিকটা ভয়ও পেয়েছে। তবে সুস্থ আছে; কোনো-কিছুর কবলে সে পড়েনি... কোনো কুপ্রভাবও নেই ওর ওপরে। সব মিলিয়ে ও স্বাভাবিক..."

"কীসের কবলে পড়বে? কীসের কুপ্রভাব থাকবে? অদ্ভুত সব কথা দেখছি... এসব আবার তোমাকে বলেছেও?" উনার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলাম আমি।

"কুসংস্কার মা... কুসংস্কার সব। এই অঞ্চলের অভিজাতরাও এসব কুসংস্কারে বেশ ভালোই বিশ্বাস করে। উনি ভেবেছেন আমরাও এগুলোতে বিশ্বাসী, তাই হয়তো আশ্বস্ত করলেন," হাসলেন বাবা, "তারপরে আরো কিছু কথা বলেছিলেন। উনি বললেন, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে বেশ দূরে যেতে হচ্ছে', 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটার ওপর মহিলা একটু বেশিই জোর দিয়েছিলেন, 'কাজটা বেশ গোপনীয়, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে ওখানে পৌঁছতে হবে। তিন মাসের মধ্যে ফিরে এসে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবো। একটা ব্যাপার স্যার,

জ্ঞান ফেরার পর, আমরা কোথা থেকে আসছি বা কোথায় যাচ্ছিলাম এই ব্যাপারে আমার মেয়ে কিছু বলবে না। দয়া করে রাগ করবেন না স্যার, আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন... কিন্তু ব্যাপারটা গোপনীয়।' এইতো... এটুকুই। একদম চোস্ত ফরাসি ভাষায় কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন তিনি। 'গোপনীয়' শব্দটা উচ্চারণ করার পর বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন মহিলা। 'সমস্যা নেই মাদাম,' মৃদু হেসে বললাম আমি। তারপরেই তো দেখলেই, কত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওরা। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? একজন মা নিজের অসুস্থ মেয়েকে প্রায় অচেনা এক প্রাসাদের বাইরে রেখেই চলে গেল! যাইহোক... কী আর করা। আশা করি মেয়েটার দায়িত্ব নিয়ে ভুল কিছু করিনি।"

আমার বেশ খুশি লাগছিলো। মেয়েটার পাশে বসবো, ওর সাথে গল্প করবো... আহা, আর তর সইছিলো না। কিন্তু ডাক্তার আসার আগে তো ওখানে আমাকে যেতে দেবে না কেউ। অনেকেই হয়তো আমার কথাগুলো পড়ে হাসছেন! আসলে আপনারা যারা শহরে বাস করেন, কখনোই বুঝতে পারবেন না অমন নির্জন জায়গাতে সমবয়সি একটা বন্ধু পাওয়া কতটা আনন্দের!

ডাক্তার পৌঁছতে পৌঁছতে রাত একটা বেজে গেল। দশটার মধ্যেই শোবার ঘরে চলে যাই সাধারণত, কিন্তু সেদিন জেগে বসেছিলাম। বারবার মনে পড়ছিলো সেই গাড়িটার কথা... সেই কালো মখমলের পোশাক পরা মহিলার কথা... উনি কি কোনো রাজকন্যা? ইশশশ! যদি ওদের পিছু নিতে পারতাম! ওদের ব্যাপারে আরও জানতে পারতাম! ছোটবেলার কৌতূহল আর কি!

অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের পিছু নেওয়ার চিন্তা আমার মনে কেন এলো?

যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যে ড্রইংরুমে এলেন ডাক্তার, তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "রোগীর অবস্থা বেশ ভালো। উঠে বসেছে, নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিক, কথা-বার্তাও ঠিকমতো বলছে। শরীরে তেমন কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, খানিকটা ভয় পেয়েছিলো হয়তো। তবে এখন সামলে নিয়েছে। আপনারা এখন উনাকে দেখতে যেতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না।

ডাক্তারের কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

"মেয়েটাকে গিয়ে একটু বলুন তো, আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই," বলে পাশে দাঁড়ানো এক অনুচরকে পাঠালাম আমাদের অতিথির ঘরে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো সে।

"মাদামের কোনো আপত্তি নেই, আপনার সাথে দেখা করার জন্য উনিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন," জানালো ও।

আমাকে আর পায় কে? প্রায় ছুটে গেলাম।

প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটাতে মেয়েটার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরটা বড়, সুন্দর একটা জানালা রয়েছে, জাঁকজমকেরও কমতি নেই। ড্রইংরুমের মতো এটার দেয়ালেও নানান কারুকার্য আর মূর্তি খোদাই করা। দামি বিছানাটার পায়ের দিকের দেয়ালে ক্লিওপেট্রাকে* সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কোলে ছোট্ট একটা সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিশরের রানি। অন্য দেয়ালগুলোতেও নানান সুন্দর দৃশ্য, তবে ওগুলোর বেশিরভাগই চটে গেছে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র খুবই দামি, টেবিল চেয়াগুলোর ওপর সোনালি রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা, পর্দাগুলো এককেটা একেক রকমের। চাঁদের আলোয় ঘরটাকে কবি-কল্পনার স্বপ্নরাজ্য মনে হয়।

বিছানার পাশে দুটো মোম জ্বলছে। জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে মেয়েটা। মখমলের তৈরি কোমল ড্রেসিং গাউনে ঢেকে আছে ওর পাতলা, সুগঠিত শরীরটা... তাতে নানান আকৃতির ফুলের নকশা। মখমলের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে কোমর পর্যন্ত। গাড়ি থেকে বের করার পর এটা দিয়েই ওকে ঢেকে দিয়েছিলো ওর মা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ওর বিছানার কাছে।

"আমাদের প্রাসাদে স্বাগতম, এখন কেমন লাগছে তোমার?" মৃদু হেসে বললাম।

"বেশ আছি," আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, "তুমি কেমন আছো?"

মোমের আলোয় এই প্রথম ভালোভাবে ওর মুখটা দেখলাম আমি... কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন বোবা হয়ে গেলাম! হতভম্ব হয়ে কখন যে দুপা পিছিয়ে গেছি, নিজেই বুঝিনি।

"কী হয়েছে তোমার? অমন করছো কেন?" অবাক হলো মেয়েটা।

কী হয়েছিলো? হুম, সেসবই লিখতে যাচ্ছি।

মনে আছে ছোটবেলার সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা? সেই মেয়েটা... কী করে

---

* মিশরের শেষ ফারাও, উনার মৃত্যুর পর মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি।

ভুলি ওই মুখটা? আমার মনে যে গেঁথে গেছে! দুঃস্বপ্নে মাঝে মাঝেই এখনো হানা দেয় সেই মুখ... এতগুলো বছরেও আমাকে মুক্তি দেয়নি সেই অভিশপ্ত স্মৃতি!

আমাদের অতিথির চেহারা হুবহু সেই মেয়েটার মতো! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি... সেই অপার্থিব বিষণ্ণতামিশ্রিত সৌন্দর্য! কে এ? সেই মেয়েটাই না-কি?

মেয়েটাও আমাকে দেখছে, ওর মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠলো। যেন সে-ও আমাকে চিনতে পেরেছে!

প্রায় এক মিনিট কারো মুখে কোনো কথা নেই।

"আরেহ এ তো দেখি তাজ্জব ব্যাপার," অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো সে, "বারো বছর... বারোটা বছর আগে তোমার মুখটা আমি দেখেছিলাম... সে ছিলো এক অদ্ভুত স্বপ্ন... হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই দেখেছি, ওই মুখ আমি কোনোদিন ভুলবো না!"

অদ্ভুত ব্যাপার! সে-ও আমাকে স্বপ্নে দেখেছে?

"আসলেই অদ্ভুত," গম্ভীরকণ্ঠে বললাম আমি, এতক্ষণ এক অদ্ভুত আতঙ্ক ঘিরে ধরেছিলো আমায়, মেয়েটার কথা শুনে তা অনেকটাই কেটে গেছে, "আমিও তোমাকে দেখেছি, ওই বারো বছর আগেই... জানি না ব্যাপারটা স্বপ্ন ছিলো না-কি বাস্তবতা! কিন্তু ওটা যে তুমিই ছিলে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার মুখটা কখনোই ভুলতে পারিনি... কখনোই পারবো না। দুজনেই দুজনকে দেখেছি... জাদু-টাদু না-কি?"

আবার হেসে ফেললো মেয়েটা। আহা, কী মনোরম সেই হাসি! টোল পড়া গাল আর বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি সেই হাসিতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। একদম পরির মতো সুন্দর মেয়েটা। মুহূর্তেই আমার আড়ষ্টতা কেটে গেল।

"যাইহোক, তুমি আসাতে খুবই ভালো হয়েছে। আমরা সবাই খুশি, বিশেষ করে আমি..." মৃদু হেসে বললাম, "জানো এই প্রাসাদে আমার কোনো বন্ধু নেই, একা একা একদম ভালো লাগে না। ভাগ্যিস তুমি এলে!"

কথা বলতে বলতে ওর হাতটা ধরে ফেললাম। এমনিতেই আমি বেশ লাজুক, মানুষের সাথেও সেভাবে মেশা হয় না। কিন্তু এই মেয়েটা... এর মধ্যে কিছু একটা আছে। দেখলেই মনে হয় সবকিছু ভুলে ওর কাছে গিয়ে বসে থাকি। মেয়েটা খানিকটা লজ্জা পেলো, লাল হয়ে উঠলো ওর গালদুটো। আমার হাতে আস্তে করে চাপ দিয়ে ওর আরেকটা হাত রাখলো তার ওপর।

তারপর মিষ্টি করে হাসলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত... কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন জ্বলে উঠলো ওর চোখদুটো!

আবার চমকে উঠলাম আমি। কই না তো, ওর চোখ আগের মতোই আছে, আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা।

"তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এই বিপদের মধ্যে আমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য," আস্তে করে বললো সে। ওর পাশে বসে পড়লাম আমি।

"আচ্ছা শোনো," কেমন যেন গম্ভীর হয়ে এলো মেয়েটার গলা, "আমার মনে হয় তোমাকে ওই স্বপ্নের কথা পুরোপুরি খুলে বলা উচিত। কী বলো?"

"এখনই... উমম, আচ্ছা বলতে পারো।"

"হুম, ব্যাপারটা অদ্ভুত বুঝলে? তুমিও আমাকে দেখেছো, আমিও তোমাকে দেখেছি... তাও আবার একই সময়ে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করেছো? তখন আমরা দুজনেই অনেক ছোট ছিলাম, আমার বয়স ছিলো ছয়ের কাছাকাছি, তোমারও অমনই হবে। কিন্তু তুমি এখন যেমন হয়েছো, ঠিক সেভাবেই আমি তোমাকে দেখেছিলাম! তোমার কথা শুনে যা বুঝলাম তুমিও আমাকে এই রূপেই দেখেছো! আশ্চর্য... আচ্ছা, সেদিন হুট করেই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি... কিছু কালচে প্রাণীর সাথে! তারপর খেয়াল করলাম হুট করেই একটা অদ্ভুত ঘরের মধ্যে এসে গেছি আমি! এটা আমার ঘর নয়! ঘরটা বেশ বড়... দেয়ালগুলো খুবই সুন্দর, নিচের দিকে ওয়েইনসকোট* করা, দেয়াল-আলমারিও রয়েছে, বেশ কয়েকটা চেয়ার আর টেবিলও ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। ঘরের দুটো বিছানাই ফাঁকা। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এ কোথায় এলাম আমি? কে নিয়ে এলো? লম্বা লোহার বাতিদানটার দিকে নজর পড়লো, দুইভাগে বিভক্ত ওটা... এমন বাতিদান আগে দেখিনি। জানালার কাছে যেতে হবে, বাইরের দিকটা দেখে বুঝতে হবে যে কোথায় এসেছি... কিন্তু জানালার সাথে বিছানাটা একদম লাগানো। ওখানে যেতে হলে হয় বিছানাতে উঠতে হবে, নইলে বিছানার তলা দিয়ে যেতে হবে। কেন যেন বোকার মতো আমি বিছানার তলায় ঢুকে পড়লাম। হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়েছি, তখনই কার যেন আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসে কোনোমতে বিছানার

* দেয়ালের নিচের দিককে বিভিন্ন ফার্নিচারের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে মধ্যযুগ থেকে সেখানে কাঠের তৈরি কিছু প্যানেল বসিয়ে একটি আলাদা স্তর বানানো হতো। একে বলে ওয়েইনসকোটিং। পশ্চিমে এখনো এই চর্চা অব্যাহত আছে।

পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম... ওমা! দেখি কী... বিছানার ওপর তুমি... হ্যাঁ, হ্যাঁ... ওটা তুমিই ছিলে... অসাধারণ সুন্দরী এক তরুণী, মাথাভরতি সোনালি চুল, বড় বড় নীল চোখ... আর ঠোঁট... আহা সেই ঠোঁট! কী যে সুন্দর ... ঠিক তোমার ঠোঁট এখন যেমন।

"অত সুন্দরী মেয়ে আগে কখনো দেখিনি! বিছানায় উঠে তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর মনে হয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার এক ভয়ানক আর্তচিৎকার... উঠে দেখি তুমি আমাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করছো! আমিও ভয় পেয়ে মাটিতে নেমে পড়ি। তারপর কী হয়েছিলো মনে নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম মনে হয়। হুঁশ ফেরার পর দেখি আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি। সেই থেকে তোমার মুখটা আমি কখনোই ভুলতে পারিনি। সেই রাতে আমি তোমাকেই দেখেছিলাম... ওটা স্বপ্ন ছিলো না-কি বাস্তব তা জানি না... তবে মেয়েটা যে তুমিই ছিলে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

এবার আমার পালা, সবকিছু খুলে বললাম মেয়েটাকে। চোখ বড় বড় করে শুনলো সে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলো।

"ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ভয়ের, কী বলো?" অবশেষে মৃদু হেসে বললো সে, "কে বেশি ভয় পাবে? হুম? আমি না তুমি? সত্যি বলছি, তোমাকে দেখে আমারই ভয় পাওয়া উচিত ছিলো, পেতামও যদি তুমি এতটা সুন্দরী না হতে। অবাক ব্যাপার, দুটো সমবয়সি মেয়ে বারো বছর আগে এক অপার্থিব উপায়ে একে অপরকে দেখেছে! হাহা, পরিচয়টা যেহেতু বারো বছর আগে, তাহলে ভালো বন্ধুত্ব তো হতেই হবে, তাই না? আমার কী মনে হয় জানো? আমাদের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা ছোট থেকেই কোনো এক অতিপ্রাকৃত উপায়ে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এতগুলো বছর তোমার কথা একবারের জন্যও ভুলিনি আমি... তুমিও কি আমাকে মনে করতে? উদাস দিনগুলোতে আমার কথা ভাবতে যেভাবে আমি ভাবতাম? এক অপার্থিব শক্তি যেন আমাকে ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে তোমার দিকে। জানো, আমার না কোনো বন্ধু নেই... কখনো ছিলো না! তোমাকে খুব ভালো লেগেছে, তুমি কি আমার বন্ধু হবে?" নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, কালো চোখদুটোতে মিশে আছে রাজ্যের আকুতি আর আবেগ।

মেয়েটার মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সারারাত ওর সাথেই থেকে যাই। ঠিক যেমনটা ও বললো, "এক অপার্থিব শক্তি ওকে টেনে

নিচ্ছে আমার দিকে।" কিন্তু... ওর চাহনিতে অশুভ একটা ব্যাপার আছে, কেমন যেন অস্বস্তিকর... মনের ভেতর থেকে কে যে আমাকে বারণ করছে ওর সাথে মিশতে। এই অদ্ভুত দোটানাতে অবশেষে জয়ী হলো ওর প্রতি আকর্ষণ। মনকে বোঝালাম, "এমন সুন্দরী একটা মেয়ের মধ্যে অশুভ কিছু থাকতেই পারে না।"

ও আসাতে আগে থেকেই প্রচুর খুশি ছিলাম আমি, আর সেখানে ওর মিষ্টি কথাগুলো আরো প্রভাব ফেললো আমার ওপর। ওকে বন্ধু হিসাবে আমার চাই-ই চাই!

বিছানায় আরো খানিকটা গা এলিয়ে দিলো সে। হুম, ক্লান্ত হয়ে গেছে মেয়েটা। ওর সাথে আরেকটু গল্প করতে পারলে ভালো হতো। যাইহোক থাক, বিশ্রাম নিক।

"আচ্ছা শোনো, আমি যাই। শুভরাত্রি," উঠে দাঁড়ালাম, "আর ডাক্তার বলেছেন আজ রাতে তোমার পাশে কেউ বসে থাকলে ভালো হয়। আমি গিয়ে একজন দাসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মহিলা বেশ ভালো এবং স্বল্পভাষী। কোনো কিছু দরকার হলে উনাকে বলতে পারো।"

"আহা, আমার কত খেয়াল রাখছো তোমরা, কিন্তু ঘরে কেউ থাকলে আমার না ঘুম আসে না। তাই কাউকে পাঠানোর দরকার নেই। আসলে বুঝলে... আমি না, ডাকাতদের খুব ভয় পাই! একবার আমাদের প্রাসাদে ডাকাত পড়েছিলো, দুজন অনুচরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ওরা। এরপর থেকে আমি সবসময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমাই। এভাবেই ঘুমিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। কিছু মনে কোরো না! ওই তো, দরজার পাশে তালা-চাবি রাখা আছে। তুমি বেরোবার পরে আমি ভেতর থেকে তালা মেরে দেবো, ঠিক আছে?"

"উমম... আচ্ছা, তুমি যা ভালো মনে করো।"

এগিয়ে এলো সে, তারপর নিজের সুন্দর হাতদুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমায়। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। কানে কানে মেয়েটি ফিসফিস করে বললো, "শুভরাত্রি প্রিয় বন্ধু, তোমাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হচ্ছে... কিন্তু কিছুই করার নেই... শুভরাত্রি হে প্রিয়তমা, কাল সকালেই আমাদের আবার দেখা হবে। তবে আমি একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়লো সে। তারপর আবার ঘুরে তাকালো আমার দিকে, কেমন যেন বিষণ্ণ চাহনি, তাতে মিশে আছে অদ্ভুত এক আবেগ।

"শুভরাত্রি বন্ধু," ফিসফিস করে আবার বলে উঠলো সে।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় তালা মারার আওয়াজ কানে এলো।

মেয়েটা ভালো, অনেক ভালো। কিন্তু ওর আলিঙ্গনের মধ্যে কেমন যেন প্রেমিকসুলভ একটা ভাব আছে। ইংরেজি প্রেমের গল্প বেশ কয়েকটা পড়েছি, তাই এই ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা আছে। তারপরেও ব্যাপারটা মন্দ লাগেনি আমার। মেয়েটা আমাকে খুবই পছন্দ করে, কত সুন্দর করে কথা বলে... ভেবেছিলাম না জানি কত সময় লাগবে ওকে বুঝতে। কিন্তু এত সহজে ও আমাকে আপন করে নেবে ভাবতে পারিনি। যেন আগে থেকেই ঠিক করে এসেছে, আমার সাথে বন্ধুত্ব ওকে করতেই হবে!

পরেরদিন সকালে আবার দেখা হলো ওর সাথে। ওর সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম।

দিনের আলোতে ওকে আরো বেশি সুন্দর লাগছিলো। একটা মানুষ এত নিখুঁত সুন্দরী হয় কী করে? এত সুন্দর মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি।

অথচ ছোটবেলার স্মৃতি! কী ভয়ংকরই না লেগেছিলো সেই সুন্দর মুখটা। ওটা কি তবে শুধু স্বপ্নই ছিলো? স্বপ্নে দেখা কারো চেহারা কি এমন স্পষ্টভাবে মনে থাকে?

"বুঝলে, গতকাল ঘরে ঢুকে তোমার মুখটা দেখে যা ভয় পেয়েছিলাম!" এক ফাঁকে বলেই ফেললাম আমি।

"আরে ভাই! আর বলো না... তোমাকে দেখে আমার অবস্থাও এমনটাই হয়েছিলো। আরেকটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন দেখ, আমরা দুজনে দুজনের কত ভালো বন্ধু!"

শব্দ করে হেসে উঠলো সে। আমিও যোগ দিলাম তাতে।

মানুষের জীবন বড়ই অদ্ভুত, এককালে যা নিয়ে ভয় পেতাম, এখন সেটাই আমাদের কাছে হাসির বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বড়ই আনন্দে মেয়ে — অদ্ভুত কিছু অভ্যাস



আগেই বলেছি বেশিরভাগ দিক থেকেই মেয়েটা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

কিন্তু, ওর মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তিকর কিছু ব্যাপার ছিলো। যেগুলো ঠিক নিতে পারিনি।

আচ্ছা, ওর শারীরিক গঠনের একটু বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করি। উচ্চতা মাঝারির চেয়ে একটু বেশি। বেশ রোগা, তবে চেহারার মতো শরীরেও বিরাজ করছে অপূর্ব এক মাধুর্য। চলাফেরাতে একধরনের তীব্র আড়ষ্টতা লক্ষ করা যায়, কেমন অদ্ভুত এক জড়তা যেন সবসময় গ্রাস করে রাখে ওকে। একবার এক জায়গাতে বসলে আর নড়তেই চায় না। খুবই আস্তে আস্তে হাঁটে! প্রথম দিকে ভেবেছিলাম ওর পায়ে কোনো সমস্যা আছে... কিংবা গাড়ি থেকে পড়ে চোট পেয়েছে। পরে বুঝেছি, অমন কিছুই না। মেয়েটাই খানিকটা অলস প্রকৃতির। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফরসা, কেমন যেন একটা রক্তিম ভাবও রয়েছে। একেবারে দুধে-আলতা যাকে বলে। চমৎকার রকমের সুগঠিত ছোট্ট দেহটা। বড় বড় কালো চোখদুটো কেমন যেন রহস্যময়, খানিকক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে যেন ঘোর লেগে যায়। ঘন-লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, এত সুন্দর চুল আমি আগে কখনো দেখিনি। মাঝে মাঝেই ওই চুলে হাত বুলাই। একেবারেই ভারী নয়, কেমন যেন পাতলা ফিনফিনে আর নরম... অনেকটা রেশমের মতো। গাঢ় সোনালি রঙ, একটা চাপা বাদামি ভাব আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ওগুলো খাঁটি সোনা দিয়েই তৈরি। মাঝে মাঝেই ওর ঘরে যাই, আমাকে দেখলেই জানালার দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে পড়ে মেয়েটা, আমি ওর চুল আঁচড়ে দিই, মাঝে মাঝে উদাসভাবে বিলি কাটি... কখনো শুধু শুধুই হাত বুলাই। ও কিছুই মনে করে না। মিষ্টি করে নানান কথা বলে, ওর গলার স্বর খুবই নিচু।

নানান ব্যাপারে গল্প করে ও, আমি শুনে যাই। আর ওর চুল নিয়ে খেলি। ভাঁজ করি, আবার ছেড়ে দিই... মাঝে মাঝে দুজনেই একসাথে হেসে উঠি।

স্বর্গের দেবদূতদের কসম! তখন যদি সত্য জানতাম!

যাইহোক। বললাম না, মেয়েটার কিছু ব্যাপার আমি ঠিক যেন মেনে নিতে পারতাম না? এরকম একটা ঘটনা বলি। প্রথম রাতে কথা বলেই মনে হয়েছিলো, কারমিল্লা আমার কতই না আপনজন। কিন্তু পরে কথা বলতে গিয়ে খেয়াল করলাম, গল্প করার সময় সে কিছু ব্যাপার সযত্নে এড়িয়ে যায়। তার

পরিবারের কথা, বংশের নাম, মায়ের কথা, আত্মীয়দের কথা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা... কিছুই সে বলে না। এই অঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গর্ব করে, কার পূর্বপুরুষ কয়শ বছর আগে কোন যুদ্ধে গেছিলো তা নিয়ে এদের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু এই মেয়ে কিছুই বলে না! এই কারণেই তীব্র অস্বস্তিতে ভুগি আমি। হুম, কালো মখমলের পোশাক পরিহিতা ওই মহিলা আমার বাবাকে বলে গেছেন যে উনার মেয়ে নিজের পরিবার সম্পর্কে কিছুই বলবে না... আমরাও যেন কোনো প্রশ্ন না করি।

ব্যাপারটা আমার মেনে চলা উচিত ছিলো। কিন্তু কৌতূহল জিনিসটা বড়ই অদ্ভুত। আমার মধ্যে আবার এই জিনিস একটু বেশিই আছে। শুধু আমি কেন? কোনো মেয়েই নিজের কৌতূহলকে সামলাতে পারে না, তা সে যতই ধৈর্যশীল হোক না কেন। আর তাছাড়া আমাকে এসব বলতে ওর সমস্যাটাই বা কোথায়? বারবার বলেছি যে, ওসব আমি কাউকে বলবো না। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছি যে কথাগুলো গোপন রাখবো। তাও মেয়েটা আমাকে কিছু বলে না। কেন? আমার সততার প্রতি কি ওর বিশ্বাস নেই? আমি না-কি ওর 'স্বপ্নে দেখা বন্ধু!'

যতবারই ওকে প্রশ্নগুলো করি, মৃদু হেসে বলে, "বলা যাবে না, মায়ের নিষেধ আছে।" এমন প্রত্যাখ্যান আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

মাঝে মাঝে কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত সে। বুকের ভেতরটা অজানা কারণেই 'ধক' করে উঠত। যেন ওর মলিন হাসিতে বহু বছরের পুরোনো কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। ওর মুখ দেখেই বুঝে যেতাম, এর বেশি মুখ খুলবে এমন কোনো আশা নেই।

এমন নয় যে এসব নিয়ে কোনো ঝগড়া বা মন কষাকষি হতো আমাদের। ওর সাথে কোনো কিছু নিয়ে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হওয়া এককথায় অসম্ভব। যাইহোক, এসব ব্যাপারে বারবার ওকে জিজ্ঞাসা করতাম আমি। হয়তো এভাবে চাপ দেয়াটা উচিত হতো না, কিন্তু আমি আমার কৌতূহল আর অস্বস্তির সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতাম প্রতিবারই। অন্য কেউ হলে ঝগড়া লেগে যেত, কিন্তু মেয়েটা অমন না। ও কিছুতেই রাগ করে না, বিরক্তও হয় না। ওকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলাম।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সে আমাকে অল্প কিছু তথ্য দিলো। যা শুনে আমার

কৌতূহল তো কমলোই না বরং আরো বেড়ে গেল!

সব মিলিয়ে তিনটি বিষয় সে আমার কাছে পরিষ্কার করেছিলো–

প্রথমত, ওর নাম কারমিল্লা।

দ্বিতীয়ত, তাদের বংশ বেশ প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত।

তৃতীয়ত, ওদের বাড়ি পশ্চিমে কোনোখানে।

এটুকুই।

বংশের উপাধি কী? কুলমর্যাদাসূচক অস্ত্র* কী? তাদের জমিদারির নাম কী? এমনকি ওরা এসেছে কোন দেশ থেকে?

এসব প্রশ্নের উত্তর অজানাই রয়ে গেল।

তারপরেও হাল ছাড়িনি। একটা সময়ের পর থেকে আর জোর করতাম না, তবে নানান কৌশলে ওকে জিজ্ঞাসা করতাম।

গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝেই সুযোগ পেলে ওকে এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করতাম। ও থমকে যেত, কিন্তু বিরক্ত হতো না। কখনো প্রাসাদের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে জিজ্ঞাসা করতাম, কখনো আবার হুট করেই ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করে বসতাম। কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। ওর মুখ থেকে একটা কথাও বের হতো না এ ব্যাপারে। মাঝে মাঝে মন খারাপ করে বসে থাকতাম। কেমন বন্ধু ও আমার? একটু বিশ্বাস করতে কী হয়? মাঝে মাঝে রাগ উঠত... কিন্তু ওর সাথে খানিকটা কথা বলেই আবার শান্ত হয়ে যেতাম। একদিন না একদিন তো সবকিছু জানতে পারবোই। শুধু শুধু এত ভালো একটা বন্ধুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে কী লাভ? আমার নিঃসঙ্গ জীবনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিলো কারমিল্লা।

কিন্তু অদ্ভুত আচরণগুলো থেকেই গেছিলো ওর মধ্যে।

মাঝে মাঝেই বেশ আবেগী ভঙ্গিতে ওর সুন্দর হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরত আমার গলা, কাছে টেনে নিত আমায়। এত কাছে, ওর নিঃশ্বাস এসে পড়ত আমার ঠোঁটের ওপর। গালে গাল রেখে ফিসফিসিয়ে আমার কানে কানে বলত, "প্রিয়তমা, আমি জানি তুমি কষ্ট পেয়েছো। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো

---

* পুরো ইউরোপে সম্ভ্রান্ত বংশগুলো নিজেদের বংশের মর্যাদাকে প্রকাশ করার চিহ্ন হিসাবে একটি অস্ত্রকে বেছে নিত। প্রতিটি বংশের নিজস্ব পতাকাতে ওই অস্ত্রটি আঁকা থাকত।

না। কিছু ব্যাপারে আসলে চাইলেও কাউকে বলা যায় না। প্রকৃতির কিছু অপার্থিব নিয়মের বেড়াজালে বন্দি আমি। মন খারাপ করো না বন্ধু, তুমি কষ্ট পেলে আমারও ভীষণ খারাপ লাগে। এক অদ্ভুত প্রভাবে আবদ্ধ আমরা দুজন, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তোমার উষ্ণ জীবনের মাঝেই বেঁচে আছি আমি, আর তুমি... তুমি মারা যাবে, মিশে যাবে আমার মধ্যে... বড়ই আনন্দের সে মৃত্যু! হ্যাঁ, আমাদের ভালোবাসাই হবে তোমার মৃত্যুর কারণ... আমার আর উপায় নেই বন্ধু। ঠিক যেভাবে তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেভাবেই আমিও তোমাকে ভালোবাসি... দুইয়ে মিলে এক হয়ে যাবো। নিষ্ঠুর এক ভালোবাসার অপার্থিব আনন্দ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আমার ব্যাপারে কিছু জানতে চেও না প্রিয়তমা, সেসব কথা বলতে পারবো না... কিন্তু বিশ্বাস করো... আমি শুধুই তোমার... আমার সমস্ত সত্তা তোমাকে চায়..."

ওই উদ্ভট স্বগোতক্তির মতো কথাগুলো বলতে বলতে আমাকে নিজের কম্পমান আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিত মাঝে মাঝেই। তারপর ঠোঁটের নরম চুমু এঁকে দিত গালে।

সে এক অদ্ভুত আবেশ, প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত এক ভালোবাসা। আমি যেন হারিয়ে যেতাম ওতে...

ওর দ্বিধা আর রহস্যপূর্ণ কথাগুলো একদমই বোধগম্য হতো না।

বলতে বাধা নেই, ব্যাপারটা শুরুর দিকে বেশ হাস্যকর লাগত আমার কাছে। এভাবে একটা মেয়ে আরেকটা মেয়ের সাথে কখনো কথা বলে? বিরক্ত লাগতে শুরু করলো, ঝটকা মেরে বেরিয়ে আসতে চাইলাম সেই আলিঙ্গন থেকে। কিন্তু আমার সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে যেত... কারমিল্লার কথাগুলো যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলত আমায়। মনে হতো, আমার সবকিছু শুধুই কারমিল্লার জন্য, ও আমাকে আরো কাছে টেনে নিক... মিশিয়ে ফেলুক নিজের সাথে।

মৃদু হেসে আমায় ছেড়ে দিত কারমিল্লা। ধীরে ধীরে ফিরে পেতাম নড়াচড়ার ক্ষমতা! এ কী অদ্ভুত ব্যাপার।

ওর এই অদ্ভুত আচরণ কখনই ভালো লাগত না আমার। এরপরেও মাঝে মাঝেই আমাকে জড়িয়ে ধরত সে। চুমু খেত, গালে গাল ঠেকাত... অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করতাম, মনে হতো স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ ও

আমায় ধরে রাখত, মাথার ভেতরটা পুরো ফাঁকা হয়ে যেত, কিছুই মনে থাকত না। শুধু মনে হতো এই পৃথিবীতে শুধু দুটো মানুষ আছে... আমি আর কারমিল্লা। পুরো শরীরটা যেন মুহূর্তেই অবশ হয়ে যেত। ও ছেড়ে দেওয়ার পর আবার ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যেতাম। ফিরে পেতাম চিন্তাশক্তি। বিরক্ত লাগত... সেই সাথে খানিকটা ভয়ও পেতাম। কী আছে মেয়েটার মধ্যে? ও জড়িয়ে ধরলে অমন হয়ে যাই কেন? কিন্তু তারপরেও আমি কারমিল্লার সাথে সময় কাটাতে চাইতাম, ওর কাছাকাছি থাকতাম। এ এক অদ্ভুত দোটানা... যার কোনো পার্থিব ব্যাখ্যা নেই।

ইশশশ, যদি তখনই সন্দেহ করতাম!

এসবের পর দশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এই কথাগুলো লিখতে গিয়েও আমার হাত রীতিমতো কাঁপছে। সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এখনো মাঝে মাঝে আমি ভয় পাই সেই স্মৃতিগুলোকে। এত বছরেও ভুলতে পারিনি।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু অভিজ্ঞতা থাকে যা কখনো ভোলা যায় না। ওই সময়ে আমি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম কারমিল্লার ওপর, ওকে ছাড়া একটা মুহূর্তও চিন্তা করতে পারতাম না।

মাঝে মাঝে চুপচাপ জানালার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম আমরা দুজন। তারপরেই কারমিল্লা খপ করে ধরত আমার হাতটা, আদর করত... চাপ দিত... ওর স্পর্শ কেমন যেন মাদকতাময়। আমি মানা করতাম না, চুপচাপ চেয়ে থাকতাম ওর মুখের দিকে। সে-ও কেমন আমাকে দেখত... কেমন যেন ঘোলাটে ওর দৃষ্টি, চোখ দুটো মাঝে মাঝেই নিশাচর প্রাণীদের মতো জ্বলে উঠত। এত দ্রুত শ্বাস নিত যে ওর পোশাক রীতিমতো ওঠানামা করত!

সেই দৃশ্য দেখে অজানা কারণেই ঘেন্নায় কেঁপে উঠত আমার শরীরটা, কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসত কারমিল্লার প্রতি তীব্র অনুরাগ, ওর প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করতাম। আমাকে কাছে টেনে নিত সে, ওর দুচোখে খেলা করত এক আদিম উন্মত্ততা... আমার দুই গালে অবাধে বিচরণ করত ওর উষ্ণ ঠোঁট দুটো। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠত সে, "তুমি আমার, শুধু আমার। চিরদিনের জন্য আমারই হবে! এক হয়ে যাবো আমরা দুজন, তুমি মিশে যাবে আমার মাঝে!"

তারপর চেয়ারে ঢলে পড়ত ওর দুর্বল শরীরটা, হাত দিয়ে ঢেকে ফেলত মুখ।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাঁপতাম।

"আমরা কি দূরসম্পর্কের আত্মীয়?" মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, "এসব কথা কেন বলো তুমি? কী বোঝাতে চাও? আমাকে দেখে কি তোমার এমন কারো কথা মনে পড়ে... যাকে তুমি ভালোবাসতে? কেন তুমি এমন করো আমার সাথে? আমার ভয় করে... এ কেমন ভালোবাসা? ওই সময়ে তুমি পুরো বদলে যাও, যেন অচেনা কেউ... আমার বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়! তোমার প্রভাবে আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না... কেন এমন হয়?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলত কারমিল্লা। তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে চলে যেত।

একা একাই বসে ভাবতাম ওকে নিয়ে। কেন এমন আচরণ করে কারমিল্লা? কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পেতাম না। ওর আবেগে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা থাকত না, ওসব যে নিখাদ সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? একটা মেয়ে আরেকটা মেয়ের প্রতি এমন আবেগ কেন দেখাবে? ওর মা বলেছিলেন যে মেয়েটার ওপর কিছুর প্রভাব নেই! হুম... তা হয়তো নেই, তবে এমনও তো হতে পারে কারমিল্লার মাথা কিবজিত খারাপ? অথবা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে ও? তাই এমন উদ্ভট আচরণ করছে? কিন্তু ডাক্তার সাহেব তো বললেন ওর কোনো চোট লাগেনি... ওর আচরণ পুরোপুরি একজন প্রেমিকসুলভ। আচ্ছা, ও কি সত্যিই মেয়ে? পুরোনো গল্পের বইতে এমন অনেক কাহিনিই পড়েছি, যেখানে পুরুষেরা নানান ফন্দি-ফিকির করে নারীর ছদ্মবেশে প্রেমিকার বাড়িতে ঢুকে পড়ে... হয়তো... না না, এমন হতে পারে না। কারমিল্লা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে বহুবার, আমি ভালো করেই জানি যে ও মেয়ে। আর তাছাড়া এমন কাজ গল্পের বইতে যতটা সহজ, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন!

অন্য সময়ে ওর আচরণ সম্পূর্ণ মেয়েলি। মেয়েদের মতোই হাসে, লজ্জা পায়, কাঁদে আবার মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শুধুমাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরার সময়েই ওর আচরণ পুরুষের মতো হয়ে যায়... যেন সে এক রোমাঞ্চে ভরা প্রেমিক পুরুষ। মাঝে মাঝে আমার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকত সে, জ্বলজ্বলে ওই চোখদুটো যেন কিছু বলতে চাইত আমাকে। আমিও চেয়ে থাকতাম, কতই না সুন্দর মেয়েটা... আমাকেও অনেকে সুন্দরী বলে, কিন্তু ওর সামনে আমি বলতে গেলে কিছুই না।

এত সুন্দর একটা মেয়ের জন্য প্রেমিক পুরুষের অভাব হওয়ার কথা না। কিন্তু ও আমার সাথেই প্রেমিকের মতো আচরণ কেন করে?

কারমিল্লার চালচলনে কেমন যেন জড়তা, একটুখানি দূরত্ব যেতেও বেশ খানিকটা সময় লাগিয়ে দেয়।

কিছু কিছু ব্যাপারে ওর আচরণ বেশ দৃষ্টিকটু। ও অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাত, কখনোই বেলা একটার আগে নিচে নামত না। তারপর শুধু এক কাপ চকলেট খেত। শহুরে পাঠকেরা বিরক্ত হতে পারেন; এ আর এমন কী? শহুরে মেয়েরা খানিকটা বেলা করেই ঘুম থেকে ওঠে। কিন্তু এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, এই অঞ্চলের মেয়েরা অনেক সকালেই ঘুম থেকে উঠে যায়। যাইহোক, তারপর আমরা হাঁটতে বের হতাম। প্রাসাদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতাম, মাঝে মাঝে বনের ভেতরের ওই সেতুটার কাছে যেতাম। একটু হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত কারমিল্লা। কখনো আমাকে রেখেই প্রাসাদে ফিরে আসত আবার কখনো বাতাবি লেবুর গাছগুলোর নিচের বেঞ্চিতে বসে পড়ত। শারীরিকভাবে ক্লান্ত হলেও মনটা কিন্তু বেশ চনমনে থাকত মেয়েটার, ওই অবস্থাতেও সে বেশ ভালোই আড্ডা দিতে পারত।

গল্প বলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো ওর, এত গুছিয়ে গল্পগুলো বলত যে অবাক হয়ে শুনে যেতাম। নিঃসন্দেহে ও অনেক মেধাবী... এই অঞ্চলের মেয়ে হিসাবে একটু বেশিই বুদ্ধিমান।

মাঝে মাঝে উদাসভাবে নিজের বাড়ির কিছু ঘটনা বলে ফেলত সে, বিচিত্র সব অভিযানে যেত তার পূর্বপুরুষেরা, ছোটবেলার কিছু ভাসা ভাসা স্মৃতির কথাও বলত। সেগুলো বেশ উদ্ভট... যতটুকু বুঝলাম ওর পরিবার বা ওদের প্রাসাদের আশেপাশের লোকেদের আচার-ব্যবহার বেশ খানিকটা অদ্ভুত! ওরা এমন সব রীতিনীতি মেনে চলে যেসবের ব্যাপারে আমি কখনোই শুনিইনি!

এসব শুনেই ধীরে ধীরে বুঝাতে পারলাম যে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক দূরে কারমিল্লার দেশ। এমন এক দেশ যার সংস্কৃতি এখনো খানিকটা সেকেলে।

তো, এভাবেই একদিন বিকালে গাছের নিচে বসে গল্প করছিলাম দুজন, ঠিক তখনই আমাদের সামনে দিয়ে একটা শবযাত্রা গেল। মৃত মেয়েটাকে চিনি আমি, কয়েকবার দেখেছিও। অসম্ভবত সুন্দরী ছিলো মেয়েটা, বয়সও অল্প; বনরক্ষীদের মধ্যে একজন ওর বাবা। কলিজার টুকরা সন্তানের কফিনের পিছে পিছে চলেছে বেচারা লোকটা। আহারে, হতভাগা মানুষটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। এত অল্পবয়স্ক একটা মেয়ের মৃত্যু মানসিকভাবে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন! তারপর ও ছিলো বাবার একমাত্র মেয়ে... একেবারেই ভেঙে পড়েছে লোকটা; মনে হচ্ছিলো কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছে সে, ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে।

এলাকার কৃষকেরা তার পিছনে জোড়ায় জোড়ায় শোকগান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। ভারি মিষ্টি সে সুর।

ওরা কাছাকাছি আসতে শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, গলা মেলালাম ওদের গানে*।

পিছন থেকে আমার কাঁধ ধরে বেশ জোরে ঝাঁকি দিলো কারমিল্লা। অবাক হয়ে ফিরে চাইলাম ওর দিকে।

"কী বেসুরে গান, ওতে আবার গলা মেলানোর কী আছে?" কেমন যেন হিসহিসে কণ্ঠে বলে উঠলো মেয়েটা। স্তব্ধ হয়ে গেলাম! এ কী রকম অসামাজিক আচরণ?

"মোটেই না, গানটা অনেক সুন্দর," দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি, মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিলো। শবযাত্রার সামনে এসব কী কথা? লোকেরা যদি শুনে ফেলে? কী ভাববে? বাবাকে ওরা সবাই সম্মান করে, সেই হিসাবে আমাকেও ভালো চোখে দেখে। আর আমার বান্ধবীর মুখে এমন কথা!

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গলা মেলালাম গানে।

"আহ," আর্তনাদ করে উঠলো কারমিল্লা, "উফফফ... আমার কান... কী বিশ্রী শব্দ!" দুই কানেই কেনি আঙুল দিলো সে। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ওর সুন্দর মুখটা।

এভাবে বাধা পাবো আশা করিনি।

---

* পূর্ব ইউরোপে এটাই রীতি, শবযাত্রা কারো সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেও তাদের গানে গলা মেলায়।

"কারমিল্লা, হলো কী তোমার?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কী মনে করো হ্যাঁ?" আরো বেশি রেগে উঠলো সে, "তোমার আর আমার ধর্ম এক? এসব আমার ঘেন্না লাগে... দম বন্ধ হয়ে আসে রীতিমতো! আমার শবযাত্রা ভালো লাগে না, কী বিশ্রী হৈ চৈ! তুমি একদিন মারা যাবে... সবাই মারা যাবে... মৃত্যু তো আসবেই! এতে এত আয়োজনের কী আছে? যেন মরে গিয়ে মানুষটা খুব সুখী হয়েছে? চলো, বাড়ি যাই। তোমার বাবা হয়তো অপেক্ষা করছেন।"

"বাবা যাজকের সাথে গির্জার কবরস্থানে গেছেন। মেয়েটার শেষকৃত্যে আরকি... পুরো এলাকা জানে ব্যাপারটা! ভেবেছিলাম তুমিও জানো!"

"ওই চাষার মেয়ের ব্যাপারে আমি খবর রাখবো? কী যে বলো না!" কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চকচক করে উঠলো কারমিল্লার চোখদুটো, "চাষাভুষোদের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না। কে ওই মেয়ে? ওকে তো চিনিও না!"

"বেচারা মেয়েটা," আপনমনেই বলে উঠলাম আমি, "আজ থেকে চৌদ্দ-পনেরদিন আগে রাতের বেলা বেজায় ভয় পেয়েছিলো। ভূত দেখেছিলো না-কি! সেই থেকেই প্রচণ্ড অসুস্থ, অদ্ভুত আচরণ করত... একা থাকতে চাইত না... তারপর কালকে তো মারাই গেল।"

"চুপ চুপ," আবার কেমন যেন রেগে উঠলো কারমিল্লা, "ভূতের কথা বলো না। ভয় পাই! রাতে ঘুম হবে না আমার।"

"ব্যাপারটা তেমন নয়। ভাবছি কোনো অজানা মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে না তো? প্লেগ... বা অদ্ভুত কোনো জ্বর? আমার তো এমনটাই মনে হচ্ছে," বলে চললাম, "গ্রামের শূকর পালকের অল্প বয়স্ক বউটাও না-কি এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে। সে-ও এমনই ভয় পেয়েছিলো... ঘুমের মধ্যে না-কি ওকে কে চেপে ধরেছিলো... একটু নড়াচড়া করতেই গলা টিপে ধরে... মেয়েটার প্রায় দমবন্ধ হয়ে গেছিলো! বাবা বলেন বিশেষ কিছু জ্বরের ঘোরে না-কি মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে। সেই থেকে যে মেয়েটা বিছানায় পড়লো... আর উঠতে পারলো না। অদ্ভুত ব্যাপার জানো কারমিল্লা? ওই স্বপ্ন দেখার আগের দিনেও রীতিমতো সুস্থ ছিলো মেয়েটা... অমন তরতাজা মেয়েটা এভাবেই মারা গেল।"

"হয়েছে হয়েছে, অনেক শোক হয়েছে, আর না," বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো কারমিল্লা, "শবযাত্রাটাও গেছে। বাঁচা গেল। কী বেসুরে গান রে বাবা...

না আছে তাল, না আছে সুর! কী যে ভয় পেয়েছিলাম... বলে বোঝাতে পারবো না। কান রীতিমতো ঝালাপালা হয়ে গেল। আমার পাশে একটু বসো তো... গা ঘেঁষে বসো একদম। হাতটা ধরো দেখি... চাপ দাও... জোরে... আরো জোরে..."

অবাক হয়ে গেলাম। দুটো মেয়ের অকাল মৃত্যুর খবরেও কারমিল্লার ভাবান্তর নেই? ও কেমন মানুষ?

সরে গিয়ে আরেকটা বেঞ্চিতে বসলাম। খানিক পরে কারমিল্লাও এলো সেখানে।

চুপচাপ বেঞ্চিতে বসলো সে। আমার দিকে উদাস ভঙ্গিতে তাকালো কয়েকবার, কিছু বললাম না। বিরক্ত লাগছিলো ওকে।

হুট করেই বদলে গেল ওর ভাবভঙ্গি... কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখটা। চমকে উঠলাম আমি। অদ্ভুত এক কালো ছায়া নেমে এসেছে কারমিল্লার সুন্দর মুখটাতে, যেন ওখানে কোনো রক্ত নেই... কেমন যেন দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো সে, বাম হাত দিয়ে বেশ জোরে চেপে ধরলো ডান হাতটাকে... ভ্রু কুঁচকে অদ্ভুতভাবে কয়েকবার তাকালো আকাশের দিকে... তারপর ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলো!

"কারমিল্লা, এই কারমিল্লা?" ভয় পেয়ে বলে উঠলাম আমি।

কোনো উত্তর না দিয়ে এক দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে রইলো ও। কাঁপতে শুরু করলো ওর দেহটা। সে এক অদ্ভুত কাঁপুনি। কোনো মানুষ যে ওভাবে কাঁপতে পারে তা আমার ধারণাতেও ছিলো না। ওকে ধরে ঝাঁকালাম আমি। কিন্তু কাঁপুনি থামলো না... হঠাৎ করেই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে মেয়েটার শরীরের সমস্ত প্রাণশক্তি। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো... অদ্ভুত এক চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে ওর মুখ দিয়ে। যেন অজানা কোনো যন্ত্রণা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে!

অবশেষে কথা ফিরে এলো কারমিল্লার মুখে, মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে ও বললো, "ও... ওই আসছে... আসছে ওই শবযাত্রা... ওদের গান... আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

"কারমিল্লা, ওরা চলে গেছে," প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা তখন আমার।

"আ...আমাকে ছেড়ে যেও না... ধরো আমাকে... মরে যাচ্ছি... আ...আমি

মারা যাচ্ছি!"

জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আমার বুকে মুখ ঘষতে লাগলো কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একদম স্বাভাবিক হয়ে এলো, যেন একটু আগে কিছুই হয়নি!

"আর বলো না," হেসে উঠলো ও, "আমি আবার এসব সহ্যই করতে পারি না।"

"হুম, সমস্যা নেই। তুমি ঠিক আছো তো?" গম্ভীরকণ্ঠে বললাম।

"একদম," খোশগল্পে মেতে উঠলো সে। কিন্তু আমার যেন কেমন লাগছিলো। ওর কথা উত্তরে শুধুই "হ্যাঁ-হু" করছিলাম।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরলাম আমরা। পুরোটা রাস্তায় একটানা কথা বলেছে কারমিল্লা।

কারমিল্লার মানসিক অবস্থা আসলেই ভালো না। ঠিক ওর মা যেমনটা বলেছিলেন। কেমন অদ্ভুতভাবে রেগে উঠলো... তারপর ওই মৃগী রোগীর মতো আচরণ! আচ্ছা, ওর কি ভয়াবহ কোনো মানসিক ব্যাধি আছে?

ওই প্রথম আমি কারমিল্লাকে রাগতে দেখেছিলাম।

গ্রীষ্মের আকাশে মেঘ বেশিক্ষণ থাকে না। কারমিল্লার অমন অদ্ভুত আচরণের পরেও ওর প্রতি ভালোলাগাটা আমার আগের মতোই ছিলো। সেদিন রাতের মধ্যেই সব ভুলে ওর সাথে আড্ডাতে মেতে উঠলাম।

কিন্তু ওর হুটহাট রেগে যাওয়াটা কিন্তু থেমে থাকলো না। কিছুদিনের মধ্যেই ঘটলো আরেক অদ্ভুত ঘটনা।

এবার সেই কাহিনিই শোনাবো আপনাদের।

সেদিন ড্রইংরুমের জানালার পাশে বসেছিলাম দুজন। ঠিক তখনই টানা সেতুটা পেরিয়ে উঠানে এলো এক ভবঘুরে। লোকটাকে চিনি আমি, বছরে দুবার আমাদের প্রাসাদে আসে। সম্ভবত কাছেরই কোনো গ্রামে বাড়ি ওর। এভাবেই ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়।

কুঁজো লোকটা বেশ রোগা, মুখে ছুঁচালো কালো দাড়ি। কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হাসত ব্যাটা, এ কান থেকে ও কানে ছড়িয়ে পড়ত সেই হাসি, সাদা দাঁতগুলো চকচক করত রীতিমতো। পরনের পোশাকগুলো ছিলো হলদেটে কালো আর টকটকে লাল রঙের। এখানে সেখানে এত ফিতে আর

বেল্ট যে আমি গুনে শেষ করতে পারতাম না। সেগুলোতে ঝোলানো থাকত হরেক রকমের জিনিস।

পিঠে থাকত একটা ম্যাজিক লণ্ঠন* আর দুটো বাক্স। একটাতে থাকত উৎকট এক স্যালাম্যান্ডার* অপরটাতে ছোট্ট একটা ম্যানড্রেক*। এই উদ্ভট জিনিসগুলো দেখে বাবা বেশ মজা পেতেন।

ওগুলো কিন্তু আসল ছিলো না। লোকটা করত কী... মৃত বানর, তোতা, কাঠবিড়ালি, সজারু আর বিভিন্ন মাছের শরীরের নানান অংশ কেটে সেগুলোকে রোদে শুকাতো। তারপর সুন্দর করে সেলাই দিয়ে বানিয়েছিলো ওই আকৃতিগুলো। বেজায় নিখুঁত ওর হাতের কাজ... এতটাই যে মাঝে মাঝে ওই দুটো জিনিস দেখে আমার গা ছমছম করে উঠত।

তার সাথে আরো থাকত একটি বেহালা, এক বাক্স জাদু দেখানোর জিনিসপত্র। বেল্টে সবসময় ঝুলে থাকত এক জোড়া ধাতব পাত্র আর অদ্ভুত দুটো মুখোশ এবং নাম না জানা আরো কিছু জিনিস।

তামার হাতলওয়ালা একটা কালো লাঠিতে ভর দিয়ে চলতো সে।

তার একটা সঙ্গীও ছিলো!

ওরই মতো একটা রোগা-পাতলা কুকুর। স্বভাবটা বেশ রুক্ষ, খালি ঘেউ ঘেউ করে। দূরের কোন এক গ্রাম থেকে না-কি ওর পিছু নেয় কুকুরটা, তারপর থেকে ওর সাথেই আছে। ওর সাথেই ঘোরে, খায় আর মেজাজ ভালো থাকলে খানিক খেলাও দেখায়।

সেদিন টানা সেতুটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালো কুকুরটা। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিষণ্ন স্বরে ডাকতে লাগলো।

ততক্ষণে লোকটা আমাদের দেখতে পেয়েছে। কিম্ভূতকিমাকার হ্যাটটা খুলে ভাঙা ভাঙা ফরাসি আর জার্মান ভাষায় আমাদের অভিবাদন জানালো সে।

তারপর বেহালাটা মাটিতে রেখে ধরলো এক বেসুরে গান, সাথে উদ্ভট এক নাচ! সে এক দেখার মতো দৃশ্য বটে। হাসিতে ফেটে পড়লাম আমি। কুকুরটা

---

* সেকালে আলো ছায়ার খেল দেখানোর এক যন্ত্র।

* গিরগিটিসদৃশ উভচর প্রাণী।

* বিশেষ এক প্রকার উদ্ভিদ।

কিন্তু তখনো আর্তনাদ করে চলেছিলো।

বেহালাটা তুলে নিলো সে, তারপর হাস্যকর ভঙ্গিতে আমাদের কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে এলো জানালার দিকে। এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো কোথায় কোথায় গেছে, কী কী দেখেছে, কী কী খেলা দেখাতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

"প্রিয় লেডিরা, দেখবেন না-কি মজার সব খেলা?" মৃদু হেসে আমাকে বললো সে।

"খেলা তো দেখাচ্ছেনই," শব্দ করে হেসে উঠলাম আমি।

"আরো অনেক খেলাই আছে, লেডি," লাফিয়ে উঠলো সে, "কেবলমাত্র আপনারা মত দিলেই সেসব দেখাতে পারি!"

আবার হেসে উঠলাম।

"এই যে দেখুন," বলে বিশেষ এক প্রকার কবচ বের করলো সে, "এই কবচ থাকলে পিশাচ উপিয়ার* আপনাদের কিছুই করতে পারবে না। শুনেছি জঙ্গলে নেকড়ের মতো মানুষ শিকার করে চলেছে ওই পিশাচ, এমনকি আশেপাশের এলাকাতেও ছড়িতে পড়েছে তার আতঙ্ক। প্রিয় লেডিরা, আপনারা কি এই কবচ কিনবেন?"

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো লোকটা, কখন যে হ্যাটটা মাটিতে পড়ে গেল বুঝতেই পারলো না।

"এই কবচকে ভয় করে ওই রক্তপিশাচেরা! এটা থেকে সর্বদা দূরে থাকে। কিছুই না, শুধু বালিশের সাথে পিন দিয়ে আটকে রাখলেই হবে... ওরা কাছেও আসতে পারবে না। দূর থেকে শুধু দেখবে আর রাগে জ্বলবে..."

ভালো করে দেখলাম কবচগুলো।

বাছুরের চামড়া দিয়ে তৈরি আয়তাকার কিছু মোড়কের ওপর নানান প্রাচীন সংকেত আর ছবি আঁকা।

কারমিল্লা সাথে সাথেই একটা কবচ কিনে ফেললো। ওর দেখাদেখি আমিও কিনলাম।

খুশি হয়ে উঠলো ব্যাটা, বারবার আমাদের অভিবাদন জানাতে লাগলো।

---

* পুরাতন রুশ ভাষায় উপিয়ার অর্থ রক্তচোষা, মূলত এই থেকেই ইংরেজি ভ্যাম্পায়ার শব্দ এসেছে।

আমিও মৃদু হেসে হাত নাড়লাম। তারপর খেয়াল করলাম কেমন যেন ঘোলাটে নজরে লোকটা আমাদের দেখছে, যেন অদ্ভুত কিছু দেখে ফেলেছে! পরমুহূর্তেই একটা চামড়ার থলে খুললো সে।

সেটা থেকে বেরিয়ে এলো নানান ছোট ছোট যন্ত্রপাতি।

"এই যে দেখুন লেডিরা," আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলো সে, "নানান রকমের সমস্যার সমাধান দিতে পারি আমি... এমনকি দাঁতের সমস্যারও। আরে, কুকুরটা দেখি জ্বালিয়ে মারলো! চুপ ব্যাটা চুপ! নির্বোধ জানোয়ার কোথাকার, তোর চিৎকারে তো লেডিরা কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না!" চেঁচিয়ে উঠলো সে। কুকুরটা তখনো টানা সেতুর সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে চলেছে।

কেমন যেন এক নিঃসঙ্গ হাহাকার মিশে আছে ওই ডাকে।

"এই যে লেডি শুনুনই না," আবার বলতে লাগলো লোকটা, "আপনার ডানে বসা সুন্দরী লেডি... বোধহয় আপনার বান্ধবী, তাই না?"

মাথা নাড়লাম আমি।

"তা আপনার বান্ধবীর দাঁত কী তীক্ষ্ণ আর ধারালো... লম্বা, সরু, এমন ছুঁচালো দাঁত বহুকাল দেখিনি! বাবারে বাবা, দেখে মনে হয় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো সুচ! সুযোগ পেলেই বসে যাবে... বেশ অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলাম। উনি হাসতেই আরো ভালো করে দেখতে পেয়েছি দাঁতগুলো! চিন্তা করুন খাবার খেতে গিয়ে যদি উনার জিহ্বাতে কামড় লেগে যায়? তবে? রক্তারক্তি হয়ে যাবে তো! না না, সে হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে? এখন কী করতে হবে? আমার কাছেই রয়েছে সমাধান। এই দেখুন আমার রেতি, ছেঁদা করার যন্ত্র আর চিমটা। উনার দাঁতগুলোকে ঠিক করে দিতে পারি আমি... গোল আর সুন্দর হয়ে যাবে ওগুলো, খানিকটা ভোতাও। তখন আর দাঁতগুলো মাছের মতো দেখাবে না... উনার এই সুন্দর চেহারার সাথে ওই দাঁতগুলো একেবারেই মানায় না। অ্যা... কী হলো? লেডি কি রেগে গেলেন না-কি? বেশি কিছু বলে ফেলেছি না-কি? আহা, দেখুন তো... লেডি, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি!"

কারমিল্লা আসলেই বেশ রেগে গেছিলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জানালা থেকে সরে এলো সে।

"ভবঘুরেটার স্পর্ধা দেখেছো? আমাকে অপমান করে," হিসহিসিয়ে উঠলো কারমিল্লা, "আমার দাঁত না-কি মাছের মতো! তোমার বাবা কোথায়? উনার কাছে বিচার দেবো আমি। আমার বাবা হলে এতক্ষণে একে খুঁটিতে বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলতেন... চাবকে হাড় গুঁড়ো করে ফেলতেন একেবারে। বজ্জাতের বাচ্চা বজ্জাত, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

আরো খানিকটা সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। তখনো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো ভবঘুরেটাকে। অবাক দৃষ্টিতে কারমিল্লাকে দেখছিলো সে। খানিক পরেই স্বাভাবিক হয়ে এলো কারমিল্লা, মেয়েটা অদ্ভুত। এই রাগ তো এই শান্ত! আমার সাথে গল্প-গুজবে মেতে উঠলো ও, যেন কুঁজো লোকটা আর তার কথাগুলোকে পুরোপুরি ভুলে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবাকে খুবই মনমরা লাগছিলো। বাড়িতে ঢুকেই উনি জানালেন আরেকটা অদ্ভুত খবর পেয়েছেন। সম্প্রতি যে মেয়েদুটো মারা গেল তাদের মতো করেই আরেকটা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রাসাদ থেকে মাইলখানের দূরে বেশ কিছুটা জমি আছে আমাদের। সেখানেই কাজ করা এক কৃষকের ছোট বোন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মেয়েটা বলেছে গভীর রাতে না-কি সে ভয়ংকর কিছু একটা দেখেছে। তারপর থেকেই অসুস্থ হয়ে বিছানাগত। অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে মেয়েটার।

"হুট করে যে কী শুরু হলো," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা, "যাইহোক, হয়তো অজানা কোনো মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এখানকার কৃষকেরা বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে অদ্ভুত সব কাহিনি ছড়াচ্ছে গ্রামগুলোতে... এসব শুনেই মেয়েরা আরো বেশি বেশি ভয় পাচ্ছে! কী যে করবো! বেচারা অশিক্ষিত মানুষগুলো... যা শুনেছি আজকাল গ্রামের আড্ডাগুলোতে শুধুই এসব অপার্থিব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়। অদ্ভুত কিছুর না-কি নজর পড়েছে এই অঞ্চলে।"

"না না, ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই ভয়াবহ," বলে উঠলো কারমিল্লা।

"তুমি কী করে জানলে?" বিরক্ত হলেন বাবা।

"আমি নিজেই এককালে এসব দেখেছি... কী ভয়ংকর যে ছিলো!

বাস্তবতার বাইরেও একটা ভয়াবহ জগৎ রয়েছে।"

"আমাদের রক্ষাকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের একটা পাতাও নড়ে না। যারা উনাকে ভালোবাসে তাদের কিছুই হয় না। আমাদের প্রভু... আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের দেখবেন।"

"ঈশ্বর না... প্রকৃতি," কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে জবার দিলো কারমিল্লা, "এই অপার্থিব রোগ ছড়িয়ে পড়ছে সেটাও প্রকৃতিরই ইচ্ছা। সবকিছু প্রকৃতি থেকেই এসেছে আবার সেখানেই মিলিয়ে যাবে। এভাবে দেখলে পৃথিবীর সবকিছুই স্বাভাবিক, অপার্থিব আত্মারাও প্রকৃতিরই অংশ, তাই না? স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালে সবকিছুই হয় প্রকৃতির ইচ্ছাতে, আমরা বেঁচেও আছি প্রকৃতির দয়াতে।"

"হুম," কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বাবা, তারপর বললেন, "ডাক্তার বলেছেন আজ উনি আসবেন। গ্রামগুলো উনাকে ঘুরিয়ে দেখাবো। উনার মতামত নিয়েই পরবর্তী করণীয় ঠিক করবো ভাবছি। আপাতত আমরা সবাই অন্ধকারে।"

"ডাক্তারদের দিয়ে কখনোই আমার কোনো উপকার হয়নি," মুখ বাঁকালো কারমিল্লা।

"তুমি অসুস্থ ছিলে বুঝি?" বললাম আমি।

"অনেক... তোমার হয়তো কখনোই এমন অসুখ হয়নি! শুধু তুমি কেন, সম্ভবত এই পৃথিবীর কারোই হয়নি।"

"অনেক আগে না-কি?"

"হ্যাঁ, অনেক আগে। ঠিক এই মেয়েগুলোর মতোই অসুখে ভুগেছিলাম আমি। এখন আর তেমন কিছু মনে নেই। শুধু... ওহ হ্যাঁ অনেক ব্যথা হয়েছিলো... আর অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তবে হ্যাঁ, অন্য অসুখগুলো মতো অতটা খারাপ নয় এই অসুখটা," রহস্যময়ভাবে হাসলো ও।

"তুমি তখন অনেক ছোট ছিলে?"

"ওসব নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না, মন খারাপ হয়ে যায়," কেমন যেন ঘোরলাগা চোখে আমার দিকে চাইলো কারমিল্লা। তারপর কাছে এসে কোমর জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো আমায়। পিছে ফিরে দেখলাম বাবা জানালার কাছে কিছু কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

"তোমার বাবা আমাদের কেন ভয় দেখাচ্ছেন, হুহ?" দীর্ঘশ্বাস ফেললো কারমিল্লা, তারপরে কেমন যেন কেঁপে উঠলো। লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা, এভাবে আরো সুন্দর দেখায় মেয়েটাকে।

"আহা কারমিল্লা, উনি ভয় দেখানোর জন্য এসব বলেননি। আসলে মৃত্যুগুলো নিয়ে বাবা বেশ মর্মাহত। উনি কখনো কাউকে ভয় দেখান না।"

"তুমি ভয় পাওনি? সোনা আমার," আমার গলায় চুমু খেলো কারমিল্লা।

"তেমন না। তবে যেভাবে গ্রামে গ্রামে অসুখটা ছড়িয়ে পড়ছে... কখন কী হয় কে জানে? তাই সাবধান থাকা উচিত। আমাদেরও ওই অসুখ হতে পারে!"

"তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও?"

"হ্যাঁ, সবাই-ই পায়। এই জগতে কে মরতে চায়?"

"তুমি কি জানো, দুজন মানুষ একে অপরকে ভালোবাসলে প্রকৃতি তাদের একসাথে মৃত্যু দেয় – যাতে করে মৃত্যুর পরেও তারা একসাথে থাকতে পারে!"

"মেয়েরা আসলে এই জগতে শুঁয়োপোকার মতো থাকে... ওই পোকারা গরমকালে প্রজাপতি হয়ে যায়! ওরা ডিম পাড়ে, শূককীটের জন্ম দেয়... দেখনি এসব? অতটুকু সব প্রাণী, তাও প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আছে এমন কিছু স্বভাব যা কখনোই বদলায় না! স্বভাব বদলায় না, কিন্তু ওদের শারীরিক গঠন বদলে যায়, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে চলে যায় ওরা... মঁসিয়ে বুফন* তার সেই বইটাতে বলেছেন, 'আরেকটি দরজা, জীবনের আরেকটি পর্যায়।' আসলে জীবনের কোনো শেষ নেই, শুধু রূপ বদলায়।"

একটু পর ডাক্তার এলেন। খানিকক্ষণ বাবার সাথে দরজা লাগিয়ে আলাপ করলেন। বেশ দক্ষ মানুষ তিনি, বয়স ষাটের ওপরে হবে; বেশ পাউডার মাখেন। কুমড়োর মতো ভারী মুখটা সবসময় পরিষ্কার করে কামানো থাকে উনার।

একসাথেই দুজনে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

"আপনার মতো জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে এমন ব্যাখ্যা শুনবো একেবারেই আশা করিনি," ম্লান হাসি ফুটে উঠলো বাবার মুখে, "তা

---

* জর্জ লুই বুফন। বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ, প্রকৃতিবিদ এবং মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ।

হিপোগ্রিফ* আর ড্রাগন নিয়ে আপনার কী মতামত? এই ঘটনার পিছে ওদের হাত আছে না-কি?"

"হাহা," হাসলেন ডাক্তার, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "জীবন আর মৃত্যু বড়ই রহস্যময় জিনিস। এর কতটুকুই বা আমরা জানি? সবকিছুর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। কিছু রহস্য চিরকালই রহস্য থাকে! আমরা কোথা থেকে এসেছি? কোথায়ই বা যাবো? ধর্মের বইগুলো পড়ে অবশ্য কিছুটা জানা যায়। তবে সেই জ্ঞানও কিন্তু পরিপূর্ণ নয়!"

এটুকুই, আর কিছু শুনিনি। কথা বলতে বলতে দরজা পেরিয়ে গেলেন উনারা। তখনো বুঝিনি যে ডাক্তারের কথা শুনে এত অবাক কেন হয়েছিলেন বাবা। এখন বুঝি, যে ডাক্তার সাহেব আসলে কীসের কথা বলছিলেন।

---

* কিংবদন্তির এক প্রাণী, শরীরের সামনের অর্ধেক ঈগল আর পিছনের অর্ধেক ঘোড়ার মতো। সম্ভবত গ্রিক কিংবদন্তিতে এদের কথা সর্বপ্রথম আসে।

পঞ্চম অধ্যায়

সে এক অদ্ভুত মিল



সেদিন সন্ধ্যায় কালোমতন অল্পবয়স্ক একটা ছেলে এলো গ্রেজ* থেকে, সাথে এক ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি আর ছবিতে ভরতি দুটো বাক্স। গ্রেজে ছবি পরিষ্কার করার ব্যাবসা রয়েছে ছেলেটার বাবার। আমাদের পারিবারিক বেশ কিছু ছবি ওদেরকে দেওয়া হয়েছিলো পরিষ্কার করা জন্য, সেগুলোই ফেরত দিতে এসেছে।

আমাদের প্রাসাদ থেকে রাজধানী প্রায় দশ লিগ দূরে। ওখান থেকে যখনই কেউ আসে, প্রাসাদের বাসিন্দারা তাকে একদম ঘিরে ধরে। বিভিন্নরকম খবরাখবর নেয়ার জন্য। শহরে কী চলছে? অভিজাতরা কেমন আছে? যুদ্ধের কী অবস্থা? এমন নানান খবর জানতে চায় সবাই।

সত্য বলতে কী এসবে আমাদের কিছুই যায় আসে না, তারপরেও কৌতূহল তো কৌতূহলই।

যথারীতি ছেলেটা আসার পর হইচই পড়ে গেল পুরো বাড়িতে। বাক্সগুলো হলঘরে রাখা হলো, আর চাকরবাকররা তার যত্নআত্তিতে লেগে গেল। শেষমেষ রাতের খাবার শেষ হলে, নিজের যন্ত্রপাতি বের করে সবার সামনে ছবি দিয়ে ভরা বাক্স দুটো খোলা শুরু করলো ছেলেটা।

তারপর গাড়ি থেকে হাতুড়ি, বাটালি, স্ক্রু-ডাইভার নিয়ে এলো সে। বাক্সগুলো খুলতে হবে। ওকে সঙ্গ দিতে এগিয়ে এলো দুজন চাকর। আমরাও জড়ো হলাম বাক্স খোলা দেখতে।

শুধুমাত্র কারমিল্লার মধ্যেই কোনো উৎসাহ দেখলাম না। কোনার একটা চেয়ারে বসে উদাসভাবে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো সে। ছবিগুলোর বেশিরভাগই প্রতিকৃতি, অনেক পুরোনো সেগুলো। বেশ কটা ময়লা পড়ে একদম ঝাপসা হয়ে গেছিলো। সেগুলোকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। প্রাসাদের বিভিন্ন জায়গাতে টাঙিয়ে রাখা হবে ওগুলোকে। আমার মা ছিলেন এক প্রাচীন হাঙ্গেরিয় বংশের সন্তান, ছবিগুলোর বেশিরভাগই উনার কারণেই পেয়েছি আমরা।

ছবিগুলো একে একে বার করতে লাগলো ছোকরা। বাবার হাতে একটা

---

* অস্ট্রিয়ার স্টিরিয়া প্রদেশের রাজধানী। এটি মূলত ইংরেজদের উচ্চারণ, জার্মান ভাষায় উচ্চারণ হয় গ্রাৎস।

তালিকা, ওটা থেকে ছবিগুলোর নম্বর মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। কী যে সুন্দর ওগুলো বলে বোঝাতে পারবো না! বেশিরভাগই দীর্ঘকাল আমাদের পুরোনো গুদামে পড়ে ছিলো, তাই কখনো দেখিনি। এত পুরোনো... তাও মনে হচ্ছে ছবির মানুষগুলো একদম জীবিত! কয়েকটা ছবি আবার একটু অদ্ভুত ধরনের।

কিছু ছবি সময়ের কারণে এতটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যে ওগুলোকে কোনোভাবেই আর ঠিক করা যায়নি।

সেকালের চিত্রশিল্পীরা যে কত অসাধারণ আঁকতেন!

"কাজ কেমন হয়েছে, স্যার?" বললো ছোকরা।

"ভালোই তো লাগছে," হাসলেন বাবা, "তবে একটা ছবি খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাপার কি জানো? ওটাতে এতটাই ময়লা লেগেছিলো যে পুরো ছবিটা কখনো বুঝতে পারিনি। শুধু ওপরের এক কোণের লেখাটা পড়তে পারতাম – 'মার্সিয়া কার্নস্টাইন' আর সাল লেখা ছিলো – '১৬৯৮'; সেটা বের করো দেখি... তারপর বুঝবো তোমরা কেমন কাজ করেছো। ওটা দেখতে কেন যেন তর সইছে না।"

ওই ছবিটা আমিও দেখেছি। বসার ঘরেরই এক কোণাতে থাকত সেটা। দেড় ফুটের মতো উঁচু, প্রায় বর্গাকৃতির ছোট্ট একটা ছবি। কোনো ফ্রেম ছিলো না, সময়ের বিবর্তনে এতটাই কালচে হয়ে গেছিলো যে ওপরের ওই লেখাটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝা যেত না।

"বুঝতে পেরেছি," মৃদু হেসে বাক্সে হাত ঢোকালো ছোকরা, তারপর একটা ছবি বের এনে সগর্বে মেলে ধরলো বাবার সামনে, "দেখুন তো, এটা কি-না?"

একটা মেয়ের ছবি সেটা! কী সুন্দর... শিল্পীর হাতে জাদু আছে... যেন মেয়েটা জীবন্ত! সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো ছবির মেয়েটা হুবহু কারমিল্লার মতো দেখতে।

ওরই প্রতিকৃতি যেন!

"দেখ দেখ, কারমিল্লা," অবাক কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি, "এ যেন তোমারই ছবি! বাবারে বাবা, কী জীবন্ত! এ তো দেখি রীতিমতো অলৌকিক ব্যাপার। যেন ছবি থেকে তুমি এখনই কথা বলে উঠবে! অপূর্ব এই ছবি। খেয়াল করেছো বাবা, এমনকি এই মেয়েটার গলাতেও কারমিল্লার মতো তিল

রয়েছে!"

"হ্যাঁ, এ তো দেখছি আসলেই অদ্ভুত ব্যাপার," হাসলেন বাবা। তারপর ছোকরার দিকে ঘুরে ওর সাথে নানান কথা বলতে লাগলেন। আশ্চর্য! ব্যাপারটাকে বাবা দেখছি একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না! এত আগে আঁকা একটা ছবির সাথে কারমিল্লার চেহারা এমন মিল! এটা কী করে সম্ভব?

ছোকরার কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে ও নিজেও ছবি-টবি আঁকে। বাবাকে ছবিগুলোর যত্ন-আত্তির ব্যাপারে নানান ব্যাপার সে বুঝিয়ে বলছে। এছাড়া মধ্যযুগের ইউরোপিয় চিত্রকলা নিয়েও ছেলেটার জ্ঞান অসামান্য।

ওদিকে আমি যেন ডুবে গেলাম সেই ছবিটাতে। যতই তাকাচ্ছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম।

"বাবা, ছবিটা আমার ঘরে টাঙাতে দেবে?" বাবার দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমস্যা নেই মা," মৃদু হাসলেন বাবা, "এত সুন্দর একটা ছবি তোমার ঘরেই মানায়। ছবিটা নিয়ে বেশ আগে থেকেই আগ্রহ ছিলো আমার। একটা মেয়ের যে ছবি তা খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম, কিন্তু এত সুন্দরী মেয়ে... আর কারমিল্লার সাথে চেহারার এমন মিল... ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত!"

ওদিকে কারমিল্লা চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে, আমাদের কোনো কথাই ওর কানে যাচ্ছে না। আমার চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হাসলো। এক অদ্ভুত রহস্য খেলা করছে ওর ওই সুন্দর চোখদুটোতে।

ছবিটা ওর কাছে নিয়ে গেলাম আমি, "দেখ এবার ওপরের কোনার লেখাটা ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সোনার অক্ষরে* লেখা। বাবা ভুল পড়েছিলেন, নামটা মারসিয়া নয়। বরং মিরকাল্লা, কাউন্টেস কার্নস্টাইন... নামটার ওপর ছোট্ট মুকুটের মতো একটা চিহ্ন, তার নিচে লেখা ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দ। আমি নিজেও ওই বংশের রক্ত বহন করছি, আমার মা ওই বংশের ছিলেন তো।"

"তাই না?" কেমন যেন অলসভঙ্গিতে উত্তর দিলো কারমিল্লা, "আমিও

---

* সেকালে ইউরোপের কিছু অংশে ছবির চরিত্রের নাম সোনা গলিয়ে লেখার প্রচলন ছিলো।

ওদেরই বংশধর। তবে সম্পর্কটা বেশ দূরের। অনেক প্রাচীন বংশ তো। তা এখন ওই বংশের লোকেরা কোথায় থাকে?"

"যতদূর শুনেছি কার্নস্টাইন উপাধিধারী আর কেউ বেঁচে নেই। অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে ওই বংশটা। লোকে বলে কয়েকটা গৃহযুদ্ধের পর ওদের এই অবস্থা। তবে হ্যাঁ, ওদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে, এখান থেকে তিন মাইল দূরে জায়গাটা।"

"হুম, দুঃখজনক ব্যাপার।" একই রকম উদাস কণ্ঠে বললো সে। "আচ্ছা, দেখ বাইরে, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে," হলঘরের খানিকটা ফাঁক হয়ে যাওয়া দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলো সে, "চলো বাগান ঘুরে খানিকটা সামনে এগোই... রাস্তা পেরিয়ে বনে যাই, সেখান থেকে নদীর পাড়ে..." ঘোরলাগা গলাতে বলে যেতে লাগলো ও।

"তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিনের রাতটাও এমনই ছিলো।" মাথা নাড়লাম।

"তাই?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হাসলো কারমিল্লা।

এগিয়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো ও, আমিও ধরলাম ওরটা। ওভাবেই দরজা দিয়ে প্রাসাদের বাইরে এলাম দুজন।

ধীরে ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে টানা সেতুটার দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। চাঁদের আলোয় আজ যেন প্রকৃতি এক অপার্থিব রূপে সেজেছে, সবকিছু অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছে!

"আচ্ছা, তাহলে তুমি সেই রাতের কথা খুব ভাবছো, তাই না?" ফিসফিসিয়ে বললো কারমিল্লা, "তুমি খুশি হওনি আমি আসাতে?"

"অনেক খুশি, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে তুমি বৈচিত্র্য বয়ে এনেছো।"

"আর সেজন্যই তুমি ওই ছবিটা তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখতে চাও? ওই মেয়েটা আমার মতো দেখতে, তাই না?" মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললো সে। আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো আমার কোমর, তারপর কাঁধে মাথা রাখলো।

সবকিছুই কেমন যেন ভালো লাগছিলো আমার। কারমিল্লার সুন্দর মুখটা, ওর হাত, ওর স্পর্শ, ওর নিঃশ্বাস... সবকিছু!

"তুমি এমন কেন কারমিল্লা?" ঘোরলাগা কণ্ঠে বললাম আমি।

"কেমন?"

"এতটা প্রেমময়ী... তোমার গল্পগুলোও ঘুরেফিরে প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত হয়ে যায়। শুনতে অবশ্য বেশ ভালোই লাগে। আচ্ছা, তুমি কি কাউকে ভালোবাসো? যাকে কাছে পেতে চাও?"

টুপ করে আমার গালে চুমু খেলো কারমিল্লা।

"তোমাকে ভালোবাসি," কেমন যেন অদ্ভুত কণ্ঠে বললো সে।

"যাহহ," লজ্জা পেলাম আমি, "যাইহোক, বলতে যখন চাইছো না, জোর করবো না। তবে আমি নিশ্চিত, তুমি কারো প্রেমে পড়েছো। এখন শুধু দেখার বিষয় কে সেই সৌভাগ্যবান যুবক।"

"আমি কখনো কাউকে ভালোবাসিনি, কোনো পুরুষকে তো একেবারেই না..." হিসহিসিয়ে বলে উঠলো সে।

চমকে উঠে পিছিয়ে গেলাম।

"তবে হ্যাঁ, তোমার প্রেমে পড়তে আপত্তি নেই," হাসলো ও, "ইতোমধ্যেই পড়ে গেছি।"

চাঁদের আলোয় কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওকে, যেন কিংবদন্তির কোনো দেবী।

আমায় জড়িয়ে ধরলো কারমিল্লা, মুখ লুকালো আমার চুলে... ক্রমাগত চুমু খেতে লাগলো গলা আর বুকে... কেমন যেন ফোঁপাচ্ছিলো ও, ওর বুকটা ঠেসে ধরছিলো আমার বুকে। কাঁপছিলো বেচারির হাতদুটো।

নিজের নরম গালদুটো আমার গালে ঘষতে ঘষতে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লো সে, আমার কানে কানে বললো, "প্রিয়তমা, আমার প্রিয়তমা!"

ক্ষণিকের জন্য যেন নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ও বলে চললো, "সখি, আমি তোমার মধ্যেই বেঁচে থাকবো, তুমি হারিয়ে যাবে... তোমার মৃত্যুও হবে আমার জন্যই... তুমি আমার মাঝে মিশে যাবে! তোমাকে এতটাই ভালোবাসি।"

আমি যেন হুট করেই বাস্তবে ফিরে এলাম। ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে।

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। ওই দৃষ্টিতে মিশে আছে পৃথিবীর সব দুঃখ, বিষণ্নতা আর হাহাকার... অর্থহীন সেই উদাস চাহনি।

একটু বেশিই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো কারমিল্লাকে।

"আজকের বাতাস একটু বেশিই ঠান্ডা, হে প্রিয়তমা," আবার কাঁপতে লাগলো কারমিল্লা, "আমার পুরো শরীর কাঁপছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চলো প্রাসাদে ফিরে যাই... দেরি না করি... এখনই চলো... ফিরে যাই!"

"তোমাকে খানিকটা অসুস্থ দেখাচ্ছে কারমিল্লা," বলে উঠলাম আমি, "হ্যাঁ, চলো ফিরে যাই, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারো। গিয়ে মাদামকে বলি তোমাকে এক গ্লাস মদ দিতে।"

"হুম, চলো ফিরে যাই... গরম পানীয়ের খুব দরকার আমার। তবে এখন খানিকটা ভালো লাগছে, হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো," দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

"দাঁড়াও," হুট করেই থমকে দাঁড়ালো ও, "আরো কিছুক্ষণ থাকি এখানে, দেখ কী সুন্দর চাঁদের আলো... হয়তো এরপর আর কখনো আমাদের একসাথে জোৎস্না দেখা হবে না... এই শেষ বার।"

"কারমিল্লা, তুমি ঠিক আছো তো? কাঁপুনি এখনো আছে?" খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম আমি। আশেপাশে না-কি খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেই মহামারি, শুধু মেয়েরাই আক্রান্ত হচ্ছে ওতে। কারমিল্লারও ওই অসুখ হলো না-কি?

"তোমার যদি খুব খারাপ লাগে তবে এখনই বাবাকে গিয়ে বলি চলো," ওর হাত ধরে ঝাঁকালাম, "আশেপাশে যেভাবে ওই অসুখটা ছড়িয়ে পড়ছে! আগেভাবেই উনাকে বলা ভালো। নইলে পরে রাগ করতে পারেন। উনি খুব ভালো একজন ডাক্তারকে চেনেন, আজকেও উনি এসেছিলেন আমাদের প্রাসাদে।"

"হ্যাঁ, দেখেছি ওই ডাক্তারকে। দেখলেই বোঝা যায় অভিজ্ঞ মানুষ। তোমরা সবাই খুব ভালো। আমি আসলেই অনেক ভাগ্যবতী যে মা আমাকে তোমাদের কাছে রেখে গেছেন। কিন্তু প্রিয়তমা, আমার আসলে তেমন কিছুই হয়নি। আমি অনেক ভালো আছি। ওই একটু দুর্বলতা পেয়ে বসেছে, এইতো।

"আত্মীয়রা কী বলে জানো? আমি না-কি অনেক আলসে, ভীষণ জড়তা আমার মধ্যে। সাধারণ কোনো কাজ করতেও না-কি অনেক বেশি সময় লাগে আমার। তিন বছরে একটা বাচ্চা একবারে যতদূর হেঁটে যেতে পারে, ততটা

হাঁটলেও আমি হাঁপিয়ে যাই। মাঝে মাঝেই যেন রাজ্যের দুর্বলতা এসে ভর করে আমার শরীরে... তখন অদ্ভুত আচরণ করি... একটু আগেই তুমি যেমন দেখলে। কিন্তু ওই দুর্বলতাটা কেটে যেতেও খুব বেশি সময় লাগে না। আর এমনিও কোনো অসুখই আমাকে খুব একটা কাবু করতে পারে না। এই যে দেখ, এখন আমি পুরো সুস্থ!"

আসলেই বেশ সুস্থ মনে হতে লাগল ওকে। দুজনে মিলে অনেকক্ষণ চাঁদ দেখলাম, গল্প করলাম। কারমিল্লা যেন আরো বেশি চনমনে হয়ে উঠেছিলো, বারবার জড়িয়ে ধরছিলো আমাকে। তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়া বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল সেই সন্ধ্যাটা। ঝামেলা বলতে – কারমিল্লার অদ্ভুত আচরণ, ওর উদ্ভট কথাবার্তা, হুটহাট মৃগী রোগীর মতো আচরণ করা, অদ্ভুত চাহনি এসব ছাড়া আরকি। ভীষণ অস্বস্তি লাগত আমার এগুলোতে।

কিন্তু সেই রাতেই ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা, যার ফলে আমার চিন্তাধারা নতুন দিকে মোড় নিতে বাধ্য হলো। এমনকি কারমিল্লার মতো উদাসীন মেয়েও যেন খানিকটা সচকিত হয়ে পড়লো ব্যাপারটায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক অদ্ভুত যন্ত্রণা



বসার ঘরে ঢুকে কফি আর চকলেট খেতে বসলাম। কারমিল্লা আজ কিছুই খেলো না, তারপরেও ওকে বেশ স্বাভাবিকই দেখাচ্ছিলো। হয়তো খিদে নেই। মাদাম পেরোডোন আর মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইন বেশ কিছুক্ষণ তাস খেললেন আমাদের সাথে। তখনই বাবা চা খেতে এলেন। এই সময়টাতে চা না হলে উনার চলেই না।

চুপচাপ চা খেতে খেতে আমাদের খেলা দেখতে লাগলেন বাবা। খেলা শেষ করে সোফাতে গিয়ে বসলো কারমিল্লা, বাবাও গিয়ে বসলেন ওর পাশে।

"তোমার মায়ের সাথে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কারমিল্লা? মানে চিঠি-টিঠি?" গম্ভীরকণ্ঠে বললেন উনি।

"না," উদাসভাবে বললো কারমিল্লা।

"আচ্ছা, উনাকে কিছু বিষয় জানানোর আছে। কিন্তু উনি কোথায় আছেন তা তো জানি না। ভাবছি একটা চিঠি লিখবো, ঠিকানাটা বলবে?"

"সেটা বলা যাবে না," বাবার চোখে চোখ রাখলো কারমিল্লা, "তবে আমার সম্ভবত যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনাদের আতিথেয়তার কথা কোনোদিন ভুলব না, অনেক খেয়াল রেখেছেন আমার। অচেনা মানুষের জন্য এতটা এসময়ে কেউ করে না! যাইহোক, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের। ভাবছি কাল একটা গাড়ি ভাড়া করে উনার খোঁজে যাবো। উনি কোথায় আছেন সেটা তো জানি... কিন্তু বলতে পারছি না, এই আরকি। ব্যাপারটা বেশ গোপনীয়।"

ওর কথা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার।

"তুমি কি পাগল হয়ে গেছো, মেয়ে?" রেগে উঠলেন বাবা, "জানি না আমার কথাগুলো কীভাবে নিয়েছো। কিন্তু আমি অমন কিছু বোঝাইনি। দেখছো না আশেপাশে কী শুরু হয়েছে? এর মধ্যে তোমাকে আমরা একা ছেড়ে দেবো? কোনোভাবেই না। তোমার মা তোমাকে আমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, একমাত্র উনি ফিরে এলেই তোমাকে যেতে দেয়া হবে। চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করেছি কারণ ভদ্রমহিলা কেমন আছেন না আছেন, সেটা তো জানা দরকার। ওই বাজে অসুখটা খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, আজ সন্ধ্যাতেই আরো বেশ কয়েকটা মেয়ের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তোমার মায়ের ঠিকানা চাচ্ছিলাম কারণ, এই রোগের ব্যাপারে উনাকে লেখা দরকার। এই এলাকার সকল মেয়েরাই ওই রোগের ঝুঁকিতে আছে, এসব জানার পরেও উনি নিজের মেয়েকে এখানে রাখবেন কি-না সেটা জানতে চাইছিলাম আরকি। শোনো মিষ্টি মেয়ে... তোমার মায়ের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে

আমি ছাড়ছি না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তোমাকে দেখে রাখার... তাই এখান থেকে একা যাওয়ার চিন্তা বাদ দাও। এভাবে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। ব্যাপারটা আমাদের জন্যও বেশ বিব্রতকর হবে, আর তাছাড়া আমার মেয়েটা ইতোমধ্যেই তোমার বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেছে, তুমি হঠাৎ এভাবে চলে গেলে ও ভীষণ কষ্ট পাবে।"

"অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার," মৃদু হাসলো কারমিল্লা, লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো ওর সুন্দর গালদুটো, "আপনারা আমার জন্য যা করলেন এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না; সুন্দর এই প্রাসাদে আমার দিনগুলো একদম রূপকথার মতো কাটছে, এমন আনন্দ জীবনে খুব কমই পেয়েছি। আপনারা সবাই খুব ভালো, আর আপনার অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের কথা আর কী বলবো, ও আমার জীবনে পাওয়া সেরা বন্ধু!"

মৃদু হেসে এগিয়ে এলেন বাবা, তারপর চুমু খেলেন কারমিল্লার ডানহাতে। পুরোনো এই আদব-কায়দাগুলো বেশ ভালোই মেনে চলেন বাবা।

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কারমিল্লা। আমিও গেলাম ওর সাথে। বিছানা গোছাতে গোছাতে আমার সাথে নানান গল্পে মেতে উঠলো মেয়েটা।

"আচ্ছা কারমিল্লা," বলে উঠলাম আমি, "আমরা বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেছি। এখন তো তোমাদের পরিবারের গোপন কথাগুলো বলতেই পারো তাই না? বিশ্বাস করো, কাউকে বলবো না।"

আমার দিকে ঘুরে মৃদু হাসলো কারমিল্লা। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না। কেমন যেন অশুভ এক রহস্য খেলা করছে ওর হাসিতে।

"তুমি কিছু বলবে না, তাই না? আসলে তুমি কখনোই বলবে না... এত ভালো বন্ধু হওয়ার পরেও," দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "আসলে তোমাকে এসব জিজ্ঞাসা করাই উচিত হয়নি।"

"না না, তা নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করতেই পারো, শুধু এসব কেন... অন্য অনেক কিছুই জানার অধিকার আছে তোমার। তুমি যে আমার কতটা কাছের মানুষ তা তুমি নিজেও জানো না। অনেক বিশ্বাস করি তোমাকে, নিজের চেয়েও বেশি। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওসব কথা কাউকে বলতে পারবো না, তোমাকেও না। এ বড়ই নির্মম এক প্রতিজ্ঞা বন্ধু, গির্জার সন্ন্যাসিনীদের প্রতিজ্ঞাও হয়তো এত শক্ত হয় না। ওরা তো স্রেফ অভিনয় করে। তবে হ্যাঁ... একদিন তুমি সব জানবে, ক্রমাগত এগিয়ে আসছে সেই দিন। আমাকে নির্মম ভাবতে পারো কিংবা স্বার্থপর? কিন্তু বন্ধু তোমাকে আমি ভালোবাসি আর

ভালোবাসা চিরকালই স্বার্থপর; যত তীব্র তত বেশি স্বার্থপর। আমি হিংসুটে, হিংসা করি প্রতিটি মানুষকে যারা তোমার স্পর্শ পায়... এই হিংসা যে কতটা ভয়াবহ তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তোমাকে আমার কাছেই আসতে হবে, আমাকে ভালোবাসবে; আমার জন্যই মরবে... হয়তো ঘৃণা করবে, কিন্তু তারপরেই আমার সাথেই তোমাকে থাকতে হবে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও তুমি ঘৃণা করবে শুধু আমাকেই... আবার ভালোবাসবেও শুধু আমাকেই... মৃত্যুর পরেও চলবে এই অদ্ভুত চক্র। আমি এমনই... যাকে ভালোবাসি তাকে আমার পেতেই হবে। তা সে আমাকে ভালোবাসুক বা ঘৃণা করুক!"

"আহ কারমিল্লা," বিরক্ত হলাম আমি, "আবার ওসব আজগুবি কথা? এসবের মানে কী? ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বারবার একই কথা!"

"আসলে আমি চিরকালই খানিকটা বোকা। সবাই বলে আমার কথাগুলো খেয়ালি আর কল্পনাপ্রবণ... কিন্তু তোমার জন্য নিজেকে বদলাবো... তা বলো, কী করে কথা বলবো? গির্জার জ্ঞানী যাজকদের মতো করে? আচ্ছা তুমি কখনো বল নাচের আসরে গেছো?"

"না, তুমি গেছো? কেমন হয় আসরগুলো? নিশ্চয় অনেক চমৎকার?"

"গেছি তো, তবে কেমন হয় তা আর মনে নেই। অনেক বছর আগের কথা তো।"

হেসে ফেললাম আমি।

"কতই বা বয়স তোমার, কারমিল্লা? খুব বেশি তো না। প্রথম বল নাচের অভিজ্ঞতা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?"

"না না, মনে করতে পারি জানো? একটু চেষ্টা করলেই পারি! সবকিছু ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, ঠিক যেভাবে পানির নিচে ডুব দিলে ওপরের জগৎ দেখা যায়... ঘন, মৃদু, আলোকিত এক স্বচ্ছ মাধ্যম... সবকিছু ঠিকঠাক তারপরেও কেমন যেন এলোমেলো। রঙিন ছিলো সবকিছু, কিন্তু সেই রাতে ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটেছিলো... তাতেই বদলে গেল আমার পৃথিবী। রঙগুলোকে নিজের চোখে দেখলাম বিবর্ণ হয়ে যেতে। বিছানায়... নিজের বিছানায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আমাকে... এই যে, এখানে করা হয়েছিলো আঘাতটা," মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে বুকে হাত দিলো সে, "এরপর থেকেই আমি বদলে গেছি, আর কখনো আগের মতো হতে পারবো না।"

"কী বলো! তুমি কি মরতে বসেছিলে না-কি?"

"হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। এক নির্মম ভালোবাসার মূল্য... বড়ই অদ্ভুত

সে ভালোবাসা, যা আমার প্রাণ নিয়ে নিচ্ছিলো প্রায়। ভালোবাসার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয় বন্ধু। আর সব আত্মত্যাগেই রক্ত অপরিহার্য... বেজায় ক্লান্ত লাগছে গো, ঘুমিয়ে পড়বো। উঠে গিয়ে দরজাটা লাগাতেও ইচ্ছা করছে না।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমি। আবার ভুলভাল বকতে শুরু করেছে কারমিল্লা।

কিন্তু ওর মুখটা একদম স্বাভাবিক। ঘাড়ের পাশে ঢেউখেলানো চুলের নিচে চাপা পড়ে আছে ওর সুন্দর ছোট্ট হাতদুটো। বালিশে মাথা দিয়ে কেমন যেন জ্বলজ্বলে নজরে ও আমাকে দেখছে, যেদিকেই যাচ্ছি, ও সেদিকেই তাকাচ্ছে। অপার্থিব রকমের সুন্দরী লাগছে কারমিল্লাকে, ঠোঁটের কোণে কেমন যেন অর্থহীন হাসি।

"শুভরাত্রি কারমিল্লা," বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। কেন যেন খুব অস্বস্তি লাগছিলো।

মাঝে মাঝেই ভাবি, কারমিল্লা কখনো প্রার্থনা করে কি? ঘুমানোর আগে কখনো ওকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখিনি। সকালে উঠে বাড়ির সবাই প্রার্থনাতে যোগ দিই, কিন্তু কারমিল্লা নিচে নামে অনেক পরে। সন্ধ্যাবেলাতে হলঘরে প্রার্থনা করি আমরা, কিন্তু কারমিল্লা কখনোই আসে না। গম্ভীরমুখে বসার ঘরের এক কোনায় বসে থাকে ও।

ওকে কি ছোটবেলায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি? এ নিয়ে কখনোই ওর সাথে কথা হয়নি, তবে আমার মনে হয় না কারমিল্লা খ্রিষ্টান। ধর্ম নিয়ে কখনোই ওকে তেমন কিছু বলতে শুনিনি। ও হ্যাঁ, ওই মেয়েটার শবযাত্রার সময় বলা কথাগুলো শুনে যা মনে হয়েছিলো, ও ধর্ম ব্যাপারটা পছন্দ করে না।

অবাক লাগত আমার!

হে ঈশ্বর! তখন যদি পৃথিবীর অন্ধকার রহস্য সম্পর্কে আরো খানিকটা জানতাম, তবে কারমিল্লার এই ধর্মহীনতা বা ধর্মবিদ্বেষ নিয়ে মোটেও অবাক হতাম না।

যাইহোক, ভীতু মানুষদের আশেপাশে থাকার খানিকটা অসুবিধা আছে। এরা নিজেদের ভয়কে খুব অসাধারণভাবে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে, কোনো নরম মনের মানুষ এদের সাথে মিশলে কিছুদিনের মধ্যেই এদের মতোই ভীরু হয়ে যায়। কারমিল্লার মুখে ডাকাত আর গুপ্তঘাতকদের গল্প শুনে আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ওর মতোই রাতের বেলা ঘরের দরজায় তালা

মেরে ঘুমাতাম।

এছাড়া ঘুমানোর আগে ভালো করে পুরো ঘরটা ভালো করে দেখে নিতাম, কে জানে, কোথাও যদি কোনো ডাকাত বা গুপ্তঘাতক লুকিয়ে থাকে?

ভয় জিনিসটা বেশ সংক্রামক।

যাইহোক, ঘরে ফিরে এসব কাজ সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। টেবিলের ওপর টিমটিমে একটা মোমবাতি জ্বলছিলো। পুরো অন্ধকারে কখনোই ঘুমাতে পারি না, এটা আমার অনেক পুরোনো অভ্যাস। কোনোভাবেই এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়, এখনো এভাবেই ঘুমাই।

বেশ ক্লান্ত লাগছিলো, বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম এসে পড়লো।

এসব করে জাগতিক সব ভয়ের হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা তো হতো, কিন্তু খারাপ স্বপ্ন? পাথরের দেয়াল কিংবা বন্ধ দরজা, ঘর আলোকিত থাকুক বা অন্ধকার... কোনো কিছুই স্বপ্নকে আটকাতে পারে না। স্বপ্নের বিভীষিকাদের সামনে পৃথিবীর সব বাধাই তুচ্ছ, ওরা ইচ্ছামতো আসে আবার ইচ্ছামতোই চলে যায়। পৃথিবীতে এমন কোনো তালার মিস্ত্রী নেই, যার বানানো তালা স্বপ্নদের রুখতে পারে।

ওই রাতে আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আর সেই থেকেই ওই অদ্ভুত যন্ত্রণার শুরু।

আচ্ছা ব্যাপার কি শুধুই একটা দুঃস্বপ্ন ছিলো? আমার মনে হয় না! কারণ আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলাম।

আমি যে শুয়ে আছি, আমার ঘরে আছি, সেটাও বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারছিলাম। ঘরের চারপাশ এবং আসবাবপত্রগুলোও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার, সেই টিমটিমে আলোটা আর জ্বলছিলো না, মেঝেতে আমার পায়ের দিকে কিছু যেন একটা নড়ে উঠলো। ওটা কী তা উঠে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না! শরীর যেন বিছানায় আটকে গেছে! ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো ওটা, দেখতে পেলাম... মিশমিশে কালো বড় আকৃতির একটা বিড়ালের মতো জন্তু! চার-পাঁচ ফুটের মতো লম্বা ওটা... খাঁচায় বন্দি হিংস্র জানোয়ারের মতো এপাশ-ওপাশ করছে! চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না। প্রচণ্ড ভয়ে বিছানার সাথে মিশে গেলাম যেন! জিনিসটা আরো জোরে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার মুখের কাছে, ঘরের অন্ধকার যেন ক্রমাগতই আরো গাঢ় হয়ে উঠছিলো! ওর জ্বলন্ত চোখদুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আস্তে

করে লাফিয়ে ওটা যেন আমার বিছানায় উঠে বসলো।

ভয়ংকর ওই চোখদুটো এগিয়ে আসছে আমার দিকে... কাছে আরো কাছে! হুট করেই বুকের কাছে সুচ ফোটার মতো যন্ত্রণা হলো... যেন একজোড়া সুচ আমার বুকের এক বা দুই ইঞ্চি গভীরে ঢুকে গেছে! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো!

চিৎকার করে জেগে উঠলাম। কই অন্ধকার? মোমবাতিটা তো জ্বলছে! সেই আলোতে দেখলাম আমার পায়ের ডানদিকে বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক নারীমূর্তি। কালো রঙের একটা ঢিলেঢালা পোশাক তার পরনে... কাঁধের ওপর ছড়িয়ে আছে এলোচুল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে মেয়েটা, একটুও নড়ছে না! এমনকি শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু কম্পনটুকুও নেই। হে ঈশ্বর! একটা পাথরের চাঁইও তো অমন নিথর হতে পারে না!

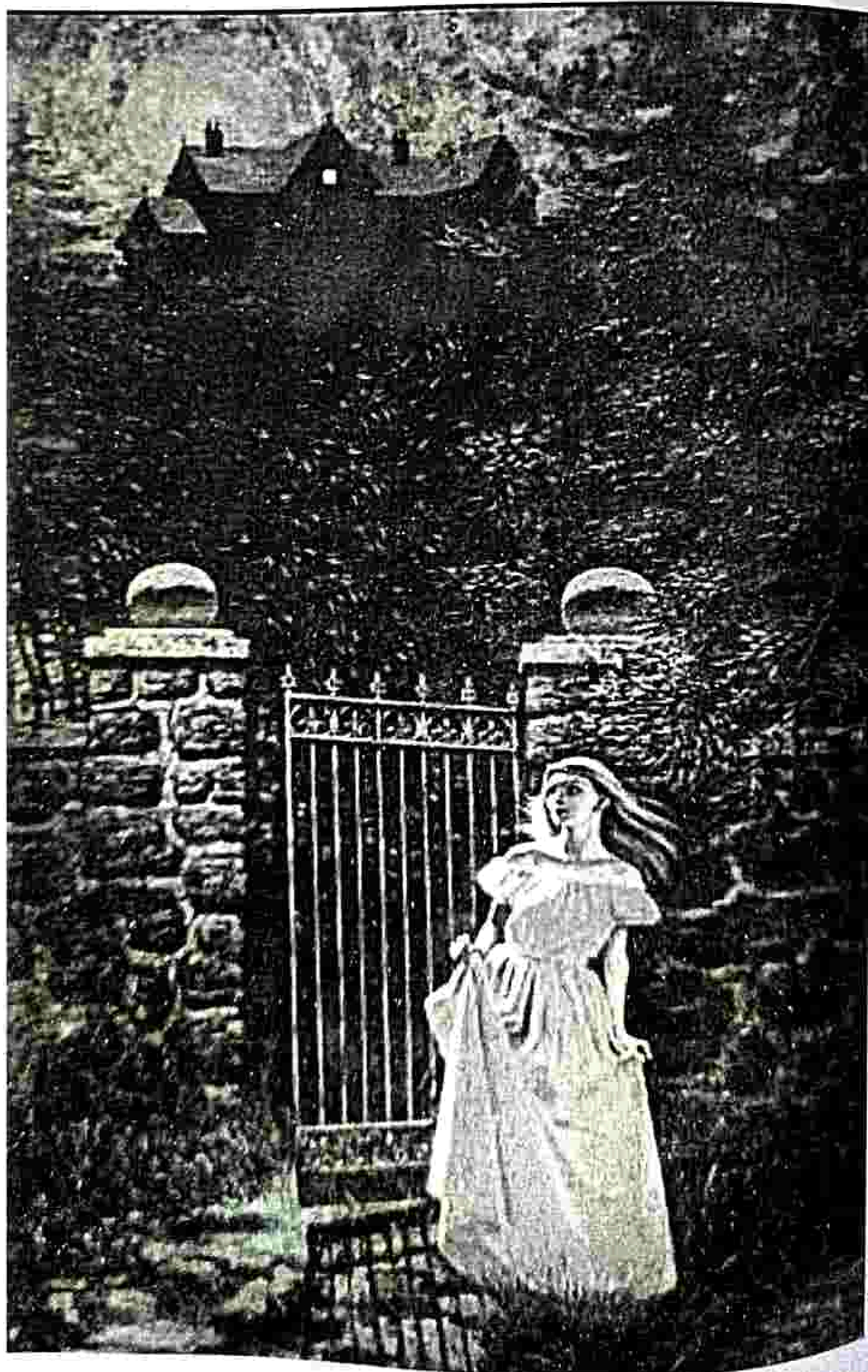
তীব্র আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুলে দেখি দরজার কাছে চলে গেছে সে... অদ্ভুত ভঙ্গিতে খুলে গেল দরজাটা, যেন অদৃশ্য কোনো হাত ওটাকে টেনে ধরেছে আর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সেই রহস্যময় নারী।

ততক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমার, নড়াচড়াও করতে পারছিলাম ঠিকমতো। প্রথমে ভাবলাম যে কারমিল্লা মজা করে ভয় দেখাতে এসেছিলো আমায়, হয়তো দরজায় তালা মারতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে, গেলাম সেখানে। এ কি! দরজাতে তো ভেতর থেকে ঠিকই তালা মারা! আতঙ্কের একটা অশুভ হিমস্রোত বয়ে গেল আমার পুরো শরীরে। বাইরে বেরিয়ে দেখবো না-কি? না না, এই অবস্থাতে আর তালা খুলতে সাহস হলো না, খুবই ভয় করছিলো। দৌড়ে এসে একলাফে বিছানায় উঠে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত মরার মতো পড়ে রইলাম।

সপ্তম অধ্যায়

অন্তর্ধান



সেই রাতে যে কতটা ভয় পেয়েছিলাম বলে বোঝাতে পারবো না, এমনকি এখনো মনে পড়লে আতঙ্কে পাথর হয়ে যাই। লিখতে গিয়েও যে প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে এক অদ্ভুত ভয়! খারাপ স্বপ্ন তো সবাই-ই কম-বেশি দেখে, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের প্রভাব কি এতটা থাকে? দিনের বেলা আরো জেঁকে বসতে লাগলো সেই অশুভ আতঙ্ক। আমার ঘরের প্রতিটি কোনা এমনকি আসবাবপত্রের মধ্যেও যেন সেই অদ্ভুত মূর্তিটাকে দেখতে পেতাম... ওই ভয়টা যেন আমার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিলো।

ওই ঘটনার পরেরদিন একটি মুহূর্তের জন্যও একা থাকতে পারলাম না, বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধকধক করত সবসময়। বাবাকে সব খুলে বলা উচিত ছিলো, কিন্তু দুটো অদ্ভুত কারণে বলতে পারলাম না। সেই কারণ দুটোও আবার বেশ খানিকটা পরস্পরবিরোধী।

প্রথমে ভাবলাম বাবা হয়তো সবকিছু শুনে হাসবেন। সত্যি বলতে কী, উনি যদি এটাকে হালকাভাবে নিয়ে ফেলতেন তাহলে সহ্য করতে পারতাম না। তারপর আবার মনে হলো, অদ্ভুত রোগটা যেহেতু ধীরে ধীরে পুরো এলাকাকেই গ্রাস করছে; আমার কথাগুলো শুনে বাবা ভেবে বসতে পারেন যে আমিও ওতে আক্রান্ত হয়েছি? তবে? না না, ওই অসুখ আমার হতেই পারে না। শুনেছি ওটা না-কি ছোঁয়াচে, এমন কি হতে পারে ওই রোগে আক্রান্ত কারও সংস্পর্শে এসেছি আমি? তাছাড়া কয়েকদিন ধরে বাবার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না, এখন এসব বললে অযথাই বেশি দুশ্চিন্তা করে শরীর আরো খারাপ করে ফেলবেন।

মাদাম পেরোডোন আর মাদামোয়াজেল লাফন্টেইনের সাথে সকালটা কাটিয়ে দিলাম। এই দুই মহিলা বাড়িতে না থাকলে আমার যে কী হতো! বেশ খানিকটা স্বস্তি পেতাম উনাদের সান্নিধ্যে থাকলে। কিন্তু উনারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার কিছু একটা হয়েছে, ভেতরে ভেতরে আমি ঠিক আগের মতো নেই। কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলছিলাম, মাঝে মাঝে কোনো কারণ ছাড়াই চুপ মেরে যাচ্ছিলাম।

শেষপর্যন্ত অবশ্য দুজনকে সব খুলে বলেছিলাম। কাউকে না বললে বুকের বোঝাটা হালকা হতো না।

সব শুনে মাদামোয়াজেল হেসে ফেললেন, কিন্তু মাদাম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আরে শোনো শোনো," হাসতে হাসতেই বললেন লাফন্টেইন, "কারমিল্লার ঘরের পিছনের লেবুগাছে ঘেরা রাস্তাটার কিন্তু খানিকটা সমস্যা আছে... শুনেছি ওখানে না-কি অতৃপ্ত আত্মারা ঘোরাফেরা করে।"

"যত্তো সব ফালতু কথা," রেগে উঠলেন মাদাম, "এখন এসব বলে মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাও না-কি? তা কোথায় শুনলে এইসব আজগুবি কথা?"

"মার্টিন আছে না? ও বলেছিলো একদিন। ওদিকের দরজাটার মেরামতি চলার সময়ে দুদিন ভোররাতে সে ওখানে গেছিলো। দুবারই এক রহস্যময় নারীমূর্তিকে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখেছে! এত রাতে ওদিকে কোন মেয়ে যাবে?

"এমন উদ্ভট জিনিস দেখা শুধু মার্টিনের পক্ষেই সম্ভব। কী দেখতে, কী দেখেছে... তারপর আজগুবি গল্প বানিয়ে তোমাকে বলেছে," বিরক্ত কণ্ঠে বললেন মাদাম।

"আমার মনে হয় না। মার্টিন খুব ভয় পেয়েছিলো। মানছি, যে ব্যাটা বেজায় বোকা। কিন্তু ওকে এভাবে ভয় পেতে আগে কখনোই দেখিনি!"

"কারমিল্লাকে এসব কথা বলা যাবে না কিন্তু," মাঝখান দিয়ে বলে উঠলাম আমি, "ওর ঘরের জানালা দিয়ে ওই রাস্তাটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়। যা ভীতু মেয়েটা... আমার চেয়েও বেশি ভয় পাবে ও!"

সেদিন কারমিল্লা অন্যদিনের চেয়েও খানিকটা দেরি করে নিচে নামলো।

"আর বলো না, কাল রাতে যা ভয় পেয়েছিলাম," আমাকে দেখেই বলে উঠলো সে, "আমি নিশ্চিত! ওই কুঁজো লোকটার কাছ থেকে কেনা কবচটা না থাকলে ভয়ংকর কিছু একটা দেখে ফেলতাম! ওটার প্রভাব আসলেই অতিপ্রাকৃত সত্তাদের দূরে রাখে। আহারে, বেচারা লোকটা, আমি ওর ওপরেই রাগ করেছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম কালোমতো কী একটা আমার বিছানার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে... প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জেগে উঠলাম। বিশ্বাস করো, চিমনির কাছে একটা নারীমূর্তি দেখেছি... মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য! তারপরেই হাওয়া! মনের অজান্তে কখন যে বালিশের তলায় হাত দিয়েছিলাম... কবচটা হাতে ঠেকামাত্র ওই নারীমূর্তিকে আর দেখতে পেলাম না। আমি নিশ্চিত! ভয়াবহ কিছু একটার আবির্ভাব ঘটেছিলো আমার ঘরে... আমার কোনো অনিষ্ট করতে চেয়েছিলো... ঠিক যেভাবে গ্রামের মেয়েগুলোকে শেষ

করেছে... বা হয়তো অন্যরকম কিছু? ওফফফ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো..."

কারমিল্লার কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন।

"হুম আমার অভিজ্ঞতাও খানিকটা এমনই," এই বলে কারমিল্লাকে সবকিছু খুলে বললাম। চোখ বড় বড় করে সব শুনলো মেয়েটা।

"তোমার কাছে কবচটা ছিলো?" কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলো ও।

"না, ওটাকে বসার ঘরের একটা চীনামাটির ফুলদানির মধ্যে রেখেছি। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওটাকে আজ রাতে বালিশের নিচেই রাখতে হবে... ওটার ওপর যখন তোমার এতটাই বিশ্বাস, আমিও খানিকটা পরখ করে দেখি।"

এতদিন পরে সবকিছু লিখছি, তারপরেও পুরো শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আপনাদের কখনোই বোঝাতে পারবো না যে ওই রাতে কতটা আতঙ্ক নিয়ে আমি ঘুমাতে গেছিলাম। একা ঘরে থাকতে খুব ভয় লাগছিলো। কবচটাকে পিন দিয়ে বালিশের সাথে আটকে নিলাম। বিছানায় উঠেই কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিলো। শুয়ে পড়তেই তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। সেই রাতে বেশ গভীর ঘুম হয়েছিলো, কোনো বাজে স্বপ্নও দেখিনি।

পরের রাতেও এমনটাই হলো। নিরবচ্ছিন্ন এক নিদ্রা, স্বপ্নরা যেন হঠাৎ ছুটি নিয়েছিলো আমার কাছ থেকে।

কিন্তু তারপরেও প্রতিদিন জেগে উঠতাম এক অদ্ভুত ক্লান্তি নিয়ে। সবকিছু কেমন যেন বিষণ্ন মনে হতে লাগলো, শরীরের পেশিগুলোতে ভর করত এক অপার্থিব শিথিলতা। মনে হতো আমার মধ্যে কিছু একটা বদলে গেছে, সেই বদলটা ঠিক ধরতেও পারছি না।

আমার 'ভালো' ঘুমের কথা শুনে কারমিল্লা বললো, "বলেছিলাম না? সবই ওই কবজের মহিমা। গতরাতে আমারও ঘুম বেশ ভালো হয়েছে। ওটাকে রাতপোশাকের বুকের কাছটায় গেঁথে রেখেছিলাম। ওই অদ্ভুত মেয়েটা আর কাছে আসতে পারছে না। কে জানে, মেয়েটা হয়তো আমার কল্পনাই ছিলো! কিংবা কেবলই স্বপ্ন। কিন্তু এসব কল্পনা আর স্বপ্ন কি এমনি এমনি আসে? ছোটবেলায় শুনেছিলাম অশুভ আত্মারা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বলতেন, 'অশুভ আত্মা বলতে আসলে কিছুই নেই। এসব নিছক স্বপ্ন, এছাড়া আরো কিছু ভয়ংকর অসুখও আছে যেগুলোর কারণে এমনটা হতে পারে। এই অসুখগুলো বেশ

ভয়াবহ... তবে মানুষকে সহজে আক্রান্ত করতে পারে না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রভাব ফেলে, এই যা। অনেকটা ঘরে না ঢুকে দরজায় টোকা দিয়ে যাওয়ার মতো।' আমার মনে হয় ডাক্তারের কথাই সত্যি।"

আবার অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেছে কারমিল্লা। একবার বলছে কবজের গুণের কথা আরেকবার ভয়ংকর অসুখের কথা!

"ডাক্তারের কথাই যদি সত্যি হবে তাহলে কবচটার কাজ কী? অসুখ থেকে এটাই না-কি রক্ষা করে?" বলে উঠলাম আমি।

"আমার তো মনে হয় কবচটা বিশেষ কোনো ওষুধে ডোবানো... কিংবা মাঝে মাঝে ওষুধ পুড়িয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করা হয় না? ওই ধোঁয়াতে কোনো জিনিস রাখলে সেটাও না-কি রোগকে দূরে রাখে। হয়তো কবচটা এই ধরনের কোনো প্রতিষেধক?"

"তাহলে এটা আমাদের শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে না? অশুভ আত্মাদের দূরে রাখে না?"

"আরে কী যে বলো। অশুভ আত্মারা এই একটুকরো জিনিস, ফিতা, ওষুধের দোকানের উৎকট গন্ধে ভয় পাবে? অদ্ভুত রোগ-জীবাণুরা সব ঘুরে বেড়ায় বাতাসে, ধীরে ধীরে এরা আমাদের মনকে প্রভাবিত করে, দুর্বল করে ফেলে স্নায়ুকে... আক্রান্ত হয় মস্তিষ্ক। কিন্তু পুরোপুরি কাবু করে ফেলার আগেই প্রতিষেধক পেলে তাদের ঠেকিয়ে দেয়া যায়। এই কবচটা তেমনই এক প্রতিষেধক। এটা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কোনো ভোজবাজির খেল নয়।"

কারমিল্লার সাথে একমত হতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে ওর কথাগুলোর মধ্যে বেশ বড় একটা ফাঁক আছে। কিছু একটা ঠিক নেই।

এরপরেও আরও কয়েকটা রাত বেশ ভালো ঘুম হলো। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরেই আমাকে ঘিরে থাকত রাজ্যের অবসাদ আর জড়তা। নড়াচড়া করতে মন চাইত না, খুব দুর্বল লাগত। ঘুমের পর এমনটা অনেকেরই হয়, কিন্তু আমার পুরোটা দিনই এমন যেত। মনে হতো আমি আর আগের সেই মেয়েটি নেই, বদলে গেছি। খুব হতাশ লাগত, মনে হতো জীবনের কোনো অর্থ নেই। অনেক চেষ্টা করেও সেই হতাশাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। মাঝে মাঝেই মৃত্যুর চিন্তা আসত মাথায়, আবছা কিছু অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠত চোখের সামনে। জীবনের ওপার থেকে মৃত্যুদূত যেন ক্রমাগত আমাকে

হাতছানি দিয়ে ডাকত, ডুবে যেতাম এক অলীক ঘোরে... স্থির আমি যেন নিজের অজান্তেই হেঁটে যেতাম এক অজানা পথে। এই অদ্ভুত আবেশকে একটা সময়ে কেন যেন বেজায় ভালো লাগতে শুরু করলো আমার, মনে হতে লাগলো এসবই সত্য, জীবন মিথ্যা। মধুর এক যন্ত্রণা যেন সর্বদা ঘিরে থাকত আমায়। এভাবেই আমার মন ধীরে ধীরে মেনে নিতে লাগলো এই অদ্ভুত সবকিছুকে।

জানতাম না কীসের প্রভাবে আচ্ছন্ন হচ্ছি, কেন হচ্ছি! কিন্তু তারপরেও আমার আত্মা যেন ভেতর থেকে নীরব সম্মতি দিয়ে সাদরে গ্রহণ করে নিত ওই প্রভাবকে।

অসুখটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিলো, কিন্তু আমার মন মানতে রাজি ছিলো না যে আমি 'অসুস্থ'। বাবাকে কিছু বলতেও ইচ্ছা করত না, যদি উনি ডাক্তার ডাকেন?

কারমিল্লা ক্রমাগত আরো বেশি আসক্ত হয়ে পড়তে লাগলো আমার প্রতি। আমাকে জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত, মাথার চুলে বিলি কেটে দিত। ওর অদ্ভুত জড়তামিশ্রিত আবেগের সামনে কেমন যেন অসহায় লাগত নিজেকে। ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম আমি, অদ্ভুত এক নজরে আমার দিকে চেয়ে থাকত কারমিল্লা। যেন আমার এই পরিবর্তনেই ওর বিজয় নিহিত! ব্যাপারটা বেশ কষ্ট দিত আমাকে, কিন্তু কিছু বলতে পারতাম না, চিন্তাশক্তিটাও কেমন যেন নিথর হয়ে পড়ছিলো দিনকে দিন।

আমার বোঝা উচিত ছিলো যে ওই রোগটার প্রায় শেষতম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি। উফফ, সে কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, এমন যন্ত্রণা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না। কী করে যে বেঁচে ছিলাম সেটাও একটা বিরাট ভাবনার ব্যাপার। প্রথম দিকে লক্ষণগুলো এতটা ভয়াবহ ছিলো না, ভেবেছিলাম খুব বেশি ক্ষতি হবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে যেন আমার শরীরের প্রতি অংশে মিশে গেল ওই ঘোরলাগা অসুখ, দূষিত করে ফেললো আমার আত্মাকে। শেষ পর্যন্ত সবকিছু এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে বুঝতে বাকি রইলো না, আমি আর বেশিদিন এই পৃথিবীতে নেই।

মৃত্যু, মুক্তি... সকল যন্ত্রণার চিরন্তন সমাপ্তি।

ওই বিচিত্র প্রভাব আমার জীবনকে এতটাই বিকৃত আর বিবর্ণ করে তুলেছিলো যে প্রাণের প্রতি সকল মায়া উঠেই গিয়েছিলো। শারীরিক অবস্থা নিয়ে আরো খানিকটা খুলে বলার ইচ্ছা আছে আপনাদের, তবে এখন না।

একটু পরে।

ঘুমের পর প্রথম যে পরিবর্তনটা অনুভব করতাম তা ছিলো বড়ই মনোরম। এই থেকেই শুরু হতো সবকিছু।

অপার্থিব এক যৌনাবেগ ছুঁয়ে যেত আমার শরীরকে, মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। মনে হতো যেন কোনো নদীতে গোসল করছি, স্রোত আমাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলেছে বিপরীত দিকে, এক আনন্দময় শীতল শিহরণ... বেশ অনেকটা সময় স্থায়ী হতো সেই অনুভূতি। এরপরেই আসত একগাদা উদ্ভট স্বপ্ন। অনেক মানুষকে দেখতাম... বিচিত্র এক প্রাসাদ আর অদ্ভুত সব রীতিনীতি। কিন্তু সবকিছু ছিলো খুবই অস্পষ্ট। সেইসব দৃশ্যগুলো একেবারেই মনে করতে পারি না, বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু একটা মানুষের মুখও মনে আসেনি, এমনকি তারা সবাই কী করত তা-ও মনে নেই। প্রায় প্রতিদিন রাতেই স্বপ্নগুলো হানা দিত, কিন্তু তারপরেও মনে থাকত না কিছুই! জেগে ওঠার পর এই স্বপ্নগুলোর একটা আবছা রেশ থেকে যেত আমার ভেতরে, হাত-পা ব্যথা করত, বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। যেন স্বপ্নগুলো আমার জীবনিশক্তি শুষে নিয়েছে।

বলতে ভুলে গেছি, স্বপ্নের একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে। প্রায় অন্ধকার একটা জায়গায় বসে রয়েছি আমি, আমার সাথে কথা বলত এমন সব মানুষ যাদের মুখ দেখা যায় না। সবচেয়ে স্পষ্ট শোনা যেত একটা নারীকণ্ঠ। বহুদূর থেকে আসত সেই কথাগুলো, কেমন যেন অপার্থিব রকমের শান্ত ছিলো সেই কণ্ঠ। প্রচণ্ড ভয় পেতাম, কিন্তু সেই সাথে ভালোও লাগত। অদ্ভুত রকমের এক শিহরণ বয়ে যেত পুরো শরীরে। মাঝে মাঝে মনে হতো কেউ আমার গাল আর গলাতে হাত বোলাচ্ছে, বড়ই প্রেমময় সেই স্পর্শ। আবার কখনো উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ পেতাম আমার ঠোঁটে, থুতনিতে তারপর গলাতে... এখানেই এসেই থেমে যেত ঠোঁটদুটো। বুকের ভেতরটা ধকধক করত, জোরে জোরে শ্বাস নিতাম... তারপরেই কে যেন আমার শ্বাসরোধ করত, গলার কাছ থেকে একটা তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে যেত পুরো শরীরে। ফোঁপানির মতো একটা শব্দ কানে আসত।

তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই। কে জানে? হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ওই যে বললাম না, আমার শরীর খারাপ নিয়ে আরো খানিকটা বলবো? এবার বলছি শুনুন।

তিন সপ্তাহ পর আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। শরীরে বেশ ভালো করে ফুটে উঠলো অসুখের চিহ্নগুলো। গায়ের রঙ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, চোখদুটো যেন বেরিয়ে এলো কোটর থেকে, চোখের নিচে কালি পড়ে গেল। শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে যেন গ্রাস করে ফেলত সীমাহীন জড়তা, এক পা হাঁটতেও ভীষণ অলস লাগত।

এসব বাবার চোখ এড়ালো না। মাঝে মাঝেই উনি জিজ্ঞাসা করতেন, "মা, তোমার কি শরীর খারাপ?" এক অদ্ভুত জেদ কাজ করত আমার মধ্যে। প্রতিবারই বলতাম, "বেশ আছি, কিচ্ছু হয়নি।"

একদিক দিয়ে ব্যাপারটা খানিকটা সত্যিও। জেগে থাকা অবস্থায় আমার কোনো ব্যথা হতো না। শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে শুধু শুধুই অভিযোগ করার কী আছে? হয়তো খারাপ স্বপ্নগুলোর কারণে অমনটা হয়!

কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে ব্যথাগুলোকে যে খুবই বাস্তব মনে হতো! তারপরেও কী একটা অদ্ভুত জেদের বশে সবকিছু গোপন করে রাখলাম। নিজের মতো করে ভেবে নিলাম, হয়তো স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে এমনটা হচ্ছে।

মাঝে মাঝে কোনো কারণ ছাড়াই মনটা খারাপ হয়ে যেত। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া ওই অদ্ভুত রোগটার কথা মনে পড়ত।

না না, আমার ওই অসুখ হতেই পারে না। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ভুগছি আমি, যেখানে ওই মেয়েগুলোর বেশিরভাগই তিন দিন বা তারও কম সময়ে মারা গেছে। অবসান হয়েছে ওদের সকল কষ্টের।

কিন্তু আমার এই যন্ত্রণার কি কোনো শেষ আছে?

কারমিল্লাও না-কি প্রতি রাতেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত, ঘুম থেকে ওঠার পর দেখা দিত জ্বর জ্বর ভাব। কিন্তু ওর অবস্থা আমার মতো নয়, ভালো করে দেখেছি। চেহারাতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। আমার অবস্থা দিন দিন আরো ভীতিকর পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলো।

সত্যি বলছি! ওই সময়ে আমি স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। নইলে শরীর এতো দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরেও বাবাকে কেন বলিনি? আমার উচিত ছিলো সাথে সাথে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যেন এক অজানা মাদকের নেশা আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো সবকিছু। ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিলাম অলীক এক কল্পনার সাগরে।

এবার আপনাদের এমন এক স্বপ্নের কথা বলবো যা আমাকে নিয়ে গেছিলো

অজানা ভয়ের রাজ্যে!

সেদিন রাতেও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে সেই অদ্ভুত নারীকণ্ঠের কথাগুলো শুনছিলাম। ঠিক তখনই অদ্ভুত আরেকটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সেটাও নারীকণ্ঠ... স্নেহভরা, মধুর এবং একই সাথে ভয়ংকর রকমের অশুভ। সেই কণ্ঠ বলে উঠলো, "সাবধান... তোমার মা বলেছেন এক ভয়ানক গুপ্তঘাতক তোমাকে খুঁজছে!"

এখনো আমার মনে আছে লাইনটা!

ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বলে উঠলো ঘরের আলোটা... দেখলাম আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারমিল্লা... রক্তের একটা ধারা চিবুক থেকে নেমে ভিজিয়ে দিয়েছে ওর রাতপোশাক... টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে পায়ে।

ভয়াবহ আর্তনাদ করে জেগে উঠলাম। এসব কী শুনলাম? তবে কি কারমিল্লাকে কেউ খুন করে ফেলেছে? বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দরজা খুলে বারান্দায় এসে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে শুরু করলাম।

চিৎকার শুনে সবার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মাদাম আর মাদামোয়াজেল। বারান্দাতে সবসময়ই একটা প্রদীপ জ্বলে, সেই আলোতে সবাই বেশ ভালো করেই দেখতে পেল আমায়।

"কী হয়েছে, হ্যাঁ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মাদাম।

"কারমিল্লা... ওর ঘরে... চলুন তাড়াতাড়ি," কোনোমতে বলে উঠলাম আমি।

উনারা আমাকে নিয়ে গেলেন ওর ঘরের সামনে। বেশ কয়েকবার কড়া ন্যাড়া হলো, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো উত্তর এলো না।

দুমদাম করে ধাক্কা মারা হলো, চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই!

কী করবো এখন? দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ! তিনজনে ভয়ে ভয়ে আমার ঘরে ফিরলাম। বেশ জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলাম তিনজন মিলে। বাবার ঘর আশেপাশে হলে উনি এতক্ষণে চলে আসতেন, তখন আর ভয়ের কিছু থাকত না। কিন্তু ঘরটা এতই দূরে যে ঘণ্টার আওয়াজ বাবা হয়তো শুনতেও পাবেন না। এখন উনার ঘরে যেতে হলে প্রাসাদের অন্ধকার অলি-গলি

পেরোতে হবে। কারমিল্লা নেই! প্রাসাদে কি তবে ডাকাত পড়েছে? এই অন্ধকারে বাবার ঘরের দিকে যাওয়ার সাহস আমাদের কারোই হলো না।

ওদিকে ঘন্টার আওয়াজ শুনে কয়েকজন অনুচর দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। ওদের গলার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি রাতপোশাক ছেড়ে ড্রেসিং গাউন আর স্যান্ডেল পরে নিলাম। মাদাম আর মাদামোয়াজেল গাউন পরেই বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হলাম।

"কী হয়েছে মাদাম?" ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো একজন অনুচর।

ওদেরকে নিয়ে কারমিল্লার ঘরের সামনে গেলাম। সবাই মিলে আবার ধাক্কাতে লাগলাম দরজা। আমি আবার কারমিল্লার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু কোনো উত্তর নেই।

অনুচরেরা অবাক হয়ে গেল! অসহায় চোখে আমার দিকে তাকালেন মাদাম আর মাদামোয়াজেল।

"দরজা ভেঙে ফেলো," কঠোর গলায় হুকুম করলাম আমি।

কয়েকজন অনুচর মিলে সহজেই ভেঙে ফেললো দরজাটা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আলোটা উঁচু করে ধরলাম, আমার পিছে মাদাম আর মাদামোয়াজেল।

পুরো ঘরটা কেমন যেন রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা।

"কারমিল্লা," ডেকে উঠলাম আমি। পেরোডোন আর লাফন্টেইনও ডাকলেন। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

আস্তে করে ঘরে ঢুকলাম। পুরো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম মুহূর্তেই, সবকিছু আগের মতোই আছে। কোথাও কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্নমাত্র নেই। কারমিল্লার সাথে গল্প করে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঘরটা যেমন ছিলো ঠিক তেমনই আছে।

শুধু কারমিল্লা কোথাও নেই!

অষ্টম অধ্যায়

খোঁজ



অদ্ভুত ব্যাপার! গেল কোথায় কারমিল্লা? পুরো ঘরটা আগের মতোই আছে, কিন্তু ও নেই। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম যেন।

খানিকটা ধাতস্থ হয়েই অনুচরদের সেখান থেকে চলে যেতে বললাম।

"আচ্ছা," বলে উঠলেন মাদামোয়াজেল, "হয়তো দরজার ধাক্কাধাক্কিতে ভয় পেয়েছে কারমিল্লা? ভেবেছে বাড়িতে ডাকাত পড়েছে? ওদের হাত থেকে বাঁচতে বিছানা থেকে উঠে পর্দার আড়ালে লুকিয়েছে মেয়েটা।"

মাথা নাড়লাম আমি। তারপর সবাই মিলে ঘরটা খুঁজে দেখতে লাগলাম। কয়েকবার কারমিল্লার নাম ধরেও ডাকলাম আমি।

কিন্তু কারমিল্লাকে পাওয়া গেল না। জানালাগুলো ভালো করে দেখলাম। সেগুলো বেশ ভালো করেই ভেতর থেকে লাগানো আছে! তীব্র আতঙ্ক আর হতাশা যেন ঘিরে ধরলো আমাদের।

মেঝেতে বসে পড়লাম আমি, আরেকটু হলে কেঁদেই ফেলতাম।

"কারমিল্লা," মিনতি করলাম, "দয়া করে বেরিয়ে এসো। তুমি কি লুকিয়ে থেকে আমাদের সাথে মজা করতে চাইছো? অনেক হয়েছে! আর না... বেরিয়ে এসো না... দেখ আমরা কত চিন্তায় আছি!"

কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিলো আমার। কিন্তু কারমিল্লা এলো না।

বুঝতে পারলাম ও আসলেই ঘরে নেই, এমনকি ঘরের ভেতরের যে ছোট্ট সাজঘরটা রয়েছে সেটার দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ ছিলো। ওটা খুঁজতেও বাকি রাখলাম না আমরা। কিন্তু কোথাও নেই ও।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, সাজঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কারমিল্লা তবে গেল কোথায়? তখনই একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো। প্রাসাদের বৃদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক বলে যে এখানে না-কি একটা গোপন রাস্তা রয়েছে, যুদ্ধের সময় পালানোর জন্য ওটা বানানো হয়েছিলো। যদিও ওটা কোথায় আছে সেটা জানা যায়নি। তবে কি কারমিল্লা ওই রাস্তাটাই খুঁজে পেয়েছে?

ওকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না। গেল কোথায় মেয়েটা? মাদাম আর মাদামোয়াজেলও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ততক্ষণে রাত প্রায় চারটা বেজে গিয়েছিলো। মাদামের ঘরেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলাম তিনজন। অবশেষে ভোর হলো।

পরেরদিন সকালে বাড়ির যে কী অবস্থা দাঁড়ালো... বলে বোঝাতে পারবো না। বাবার কানে খবরটা যেতেই সমস্ত অনুচরদের নিয়ে উনি প্রাসাদের প্রতিটি

কোনা খুঁজে দেখলেন, বাগানটাও ভালোভাবে তল্লাশি করা হলো। কিন্তু কারমিল্লা কোথাও নেই! যেন কোনো উন্মত্ত জলধারাতে ছোট্ট একটা মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা সবাই! হতাশায় রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন বাবা। কারমিল্লার মা ফিরলে কী জবাব দেবেন তাকে?

চুপচাপ বসার ঘরের সোফাতে বসে রইলাম আমি। তবে কি হারিয়ে গেল আমার বন্ধু? এ কষ্ট যে অসহনীয়!

প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা আর শঙ্কার মধ্যে কেটে গেল পুরো সকালটা। বেলা একটা বেজে গেল, কিন্তু কারমিল্লার কোনো খোঁজ নেই। কী মনে করে কারমিল্লার ঘরে গেলাম... এ কি! সাজঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছে কারমিল্লা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়লাম।

আমার দিকে তাকালো কারমিল্লা, ওর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট, হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে ডাকলো আমায়।

দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। ফিরে এসেছে! আমার বন্ধু ফিরে এসেছে! তীব্র এক উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলাম। বারবার চুমু খেতে লাগলাম ওকে। টেবিল থেকে ঘণ্টাটা তুলে নিয়ে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে বাজালাম। কারমিল্লাকে পাওয়া গেছে, এটা সবাইকে জানাতে হবে না? আহা, বাবা বড়ই দুশ্চিন্তায় আছেন।

"কারমিল্লা, কোথায় ছিলে তুমি?" অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "তোমার চিন্তায় আমাদের কারো রাতে ঘুম হয়নি! কোথায় গেছিলে? আর ফিরলেই বা কখন?"

"গতরাতের মতো অদ্ভুত রাত আমার জীবনে আর আসেনি," গম্ভীর কণ্ঠে বললো কারমিল্লা।

"দয়া করে সব খুলে বলো, ঈশ্বরের দোহাই!"

"হুম," বলতে শুরু করলো ও, "তখন রাত দুটো পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের মতোই ঘরের প্রধান দরজা, সাজঘর আর বারান্দায় যাবার দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেছি। বেশ ভালোই ঘুম হচ্ছিলো, যতদূর মনে পড়ে কোনো স্বপ্নও দেখিনি। ঘুম থেকে উঠে দেখি সাজঘরের সোফাতে শুয়ে আছি! ওটার দরজা খোলা... ঘরের দরজাটাও ভাঙা! এত কিছু হয়ে গেল, কিন্তু আমার ঘুম ভাঙলো না? এত মজবুত দরজা ভাঙতে নিশ্চয়ই অনেক শব্দ হয়েছে... আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ আমাকে কোলে করেই সাজঘরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও

ঘুমটা অন্তত ভাঙার কথা ছিলো, ঘুম কেন ভাঙলো না? যেখানে আমি সামান্য শব্দেও জেগে উঠি। ঘুম না ভাঙিয়ে কেউ আমাকে এক ঘর থেকে ঘরে নিয়ে গেল, আর আমি কিছু টেরই পেলাম না?

তখনই মাদাম, মাদামোয়াজেল, বাবা এবং কয়েকজন অনুচর এসে ঢুকলো ঘরে। কারমিল্লাকে দেখে তারাও অবাক! একগাদা প্রশ্ন, আলিঙ্গন আর অভিনন্দনের সাগরে ভেসে গেল সে! কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেল মেয়েটা।

একটু ধাতস্থ হয়ে সে সবাইকে ওই একই কাহিনিটাই শোনালো যা একটু আগে আমাকে শুনিয়েছিলো। সবাই এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, এসবের কী মানে? সবকিছু তো বেশ ভালো করেই খোঁজা হয়েছিলো!

তখন কারমিল্লাকে পেলাম না কেন?

উঠে দাঁড়ালেন বাবা, তারপর গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে লাগলেন। তখনই কারমিল্লার চোখে চোখ পড়লো আমার, কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাবাকে দেখছে সে... বড়ই ধূর্ত সে চাহনি!

"তোমরা এখন যাও," বলে অনুচরদের বিদায় করলেন বাবা।

"আমি গিয়ে ভ্যালেরিয়ান আর সালভোলাটাইলের* বোতল নিয়ে আসছি," বলে বেরিয়ে গেলেন মাদামোয়াজেল।

ঘরের মধ্যে এখন শুধুই আমরা চারজন। কারমিল্লা, বাবা, আমি আর মাদাম। চিন্তিত মুখে কারমিল্লার দিকে এগিয়ে এলেন বাবা, পরম আদরে ওর হাতটা ধরে সোফাতে বসালেন, নিজেও বসলেন পাশে।

"দেখ মা, কিছু মনে না করলে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?" মৃদু হাসলেন তিনি।

"অবশ্যই স্যার," হাসলো কারমিল্লা, "আমাকে যে-কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারেন আপনি। কোনো সমস্যা নেই। সবই বলবো আপনাকে, বড়ই বিভ্রান্তিকর আমার জীবন। কেমন যেন একটা আবছা অন্ধকারে ডুবে ছিলাম... সত্যি কথা বলতে এই মুহূর্তে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আসলে কী হয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করুন স্যার, যা মনে আসে... তবে হ্যাঁ, মা কিছু ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলতে মানা করেছেন। সেসব ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আমি

---

* ভ্যালেরিয়ান বিশেষ এক প্রকার গুল্ম দিয়ে বানানো তরল আর সালভোলাটাইল রাসায়নিক পদার্থ, মানসিক চাপ কমিয়ে মানুষকে শান্ত করতে সেকালে এসবের ব্যাপক প্রচলন ছিলো।

অসহায়! কোনো উত্তর দিতে পারবো না।"

"না না বাছা, সেসব আমার বেশ ভালোই মনে আছে। ওসব নিয়ে কিছু জানার আগ্রহও আমার নেই। যাইহোক, শোনো... যতোদূর বুঝলাম, গত রাতে তোমার ঘুম না ভাঙিয়ে তোমাকে সাজঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ঘরের দরজা, জানালা সবই ছিলো ভেতর থেকে বন্ধ... তাহলে কেউ ঢুকলো কী করে? এই নিয়ে একটা উদ্ভট চিন্তা এসেছে আমার মাথায়, তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো।"

দমবন্ধ করে যেন বাবার কথাগুলো শুনছিলাম আমি আর মাদাম। কারমিল্লার মধ্যে অবশ্য উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। হাতের ওপর হেলান দিয়ে উদাসভাবে বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে ও।

"আচ্ছা," খানিকটা এগিয়ে গেলেন বাবা, "প্রশ্নটা হলো, তোমার কি ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস আছে?"

"নাহ, কখনোই না। এই অভ্যাস আমার নেই।"

"খুব ছোটবেলাতে কি ছিলো? ভালো করে মনে করার চেষ্টা কর তো?"

"আরে হ্যাঁ," চমকে উঠলো কারমিল্লা, "আমার বুড়ি দাইমা একবার আমাকে বলেছিলেন... খুব ছোট থাকতে মাঝে মাঝেই না-কি আমি নিজের অজান্তেই বিছানায় উঠে বসতাম... হেঁটে বেড়াতাম!"

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন বাবা।

"যাক, এবার খানিকটা বুঝতে পারছি, ঘুমের মধ্যে নিজের অজান্তেই উঠে গেছিলে তুমি। তারপর চাবি দিয়ে দরজাটার তালা খুলে ফেলো... বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে তালা মেরে দাও দরজায়। তারপর চাবি হাতে হাঁটতে হাঁটতে কোনো ঘরে চলে গেছিলো! চিন্তা করে দেখ, এই তলাতেই ঘর আছে পঁচিশটা! এমনও হতে পারে নিচ বা ওপরতলার কোনো ঘরে চলে গিয়েছিলে? এই প্রাসাদে এত ঘর আর কুঠরি আছে যে গুনে শেষ করা যাবে না! বেশিরভাগ ঘরই পুরোনো ভারী ভারী আসবাবপত্র আর অকেজো জিনিসে ভরতি! একবার ভেবে দেখ, এই পুরো বাড়িটা একদম ভালোভাবে খুঁজতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগে যেত! বুঝতে পারছো আমি কী বলতে চাইছি?"

"একটু একটু, তবে পুরোটা নয়।"

"বাবা শোনো," বলে উঠলাম আমি, "দরজা বাহির থেকে তালা মারা ছিলো না, ভেতর থেকেই ছিলো। আমরা সবাই দেখেছি। আর তাছাড়া সাজঘর তো আগেই আমরা ভালো করে খুঁজেছিলাম, ওখানকার সোফাতে তো কেউ

ছিলো না!"

"আসলে তোমরা এতটাই ভয়ে পেয়েছিলে যে বাইরের তালাটা একদম খেয়ালই করোনি, আর তাছাড়া তখন তো বেশ অন্ধকারও ছিলো। ওই টিমটিমে আলোতে আর কতটা দেখা যায়? আসলে তোমরা দরজা ভেঙে সাজঘরে ঢোকার অনেক পরে ও এসে ওখানে শুয়েছিলো। ঘুমের ঘোরে হাঁটা আরকি, শুনলেই তো, জেগে উঠে ও নিজেও অবাক হয়েছিলো। যাইহোক আর কোনো রহস্য নেই... আমার অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে," হেসে উঠলেন বাবা, "ওর ঘুমের মধ্যে চলার অভ্যাস আছে তাই এমনটা হয়েছে। এতে কোনো ডাকাত, তালাভাঙা বাটপার, ছিঁচকে চোর... কিংবা ভূত-প্রেতের হাত নেই। এটাও মনে হয় না যে কারমিল্লার ওপর কেউ কোনো বাজে ওষুধ বা অমন কিছু প্রয়োগ করেছে, যেহেতু ঘুমে হাঁটার অভ্যাসটা ওর ছোটবেলাতেই ছিলো। তাই ও কিংবা আমাদের কারোই ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।"

হাসিমুখে আমাদের দিকে চেয়ে ছিলো কারমিল্লা। অপূর্ব সুন্দরী লাগছিলো ওকে। মুখের ওই গোলাপি আভার কোনো তুলনাই হয় না। ওকে ঘিরে থাকা অদ্ভুত জড়তা যেন সেই সৌন্দর্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ওর দিকে হাসিমুখে চেয়ে ছিলেন বাবা। আমার কেন যেন মনে হলো কারমিল্লার স্নিগ্ধ রূপের সাথে উনি আমার ক্রমাগত ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটার তুলনা করছেন।

আমার ধারণা যে সত্য তা অনেকটাই স্পষ্ট হলো উনার পরবর্তী কথায়।

"ইশশশ, আমার লরার কী যে হয়েছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ও দিন দিন," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি।

যাইহোক এভাবেই সমাপ্তি ঘটলো আমাদের সব শঙ্কার। ফিরে পেলাম বন্ধু কারমিল্লাকে।

নবম অধ্যায়

ডাক্তার



বাবা বেশ করে বোঝালেন, কিন্তু কারমিল্লা কোনোভাবেই ওর ঘরে রাতে অন্য কাউকে থাকতে দিতে রাজি হলো না। অবশেষে একজন অনুচরকে বলা হলো সে যেন রাতের বেলা কারমিল্লার ঘরের সামনে বিছানা পেতে শোয়, ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে মেয়েটা যেন কোনোভাবেই ঘুমের ঘোরে ঘর থেকে বের হতে না পারে।

সেই রাতে আর কোনো ঝামেলা হলো না। পরেরদিন বেশ সকালেই ডাক্তার সাহেব এলেন আমাকে দেখতে। খানিকটা অবাকই হলাম, উনি যে আসবেন এই ব্যাপারে আমাকে বাবা কিছুই বলেননি!

মাদাম পেরোডোন আমাকে ডেকে গ্রন্থাগারে নিয়ে এলেন, সেখানে অপেক্ষা করছিলেন সেই রাশভারী সাদা চুলের ডাক্তার সাহেব। বেঁটে-খাটো মানুষ, মাথাভরতি সাদা চুল, চোখের চশমাটাও অনেক পুরোনো।

ধীরে ধীরে তাকে খুলে বললাম আমার অসুখের কথা। সব শুনে উনার গম্ভীর মুখটা আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

একটা জানালার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম আমরা দুজন। আমার কথা শেষ হতেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, কেমন যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন আমাকে। বড়ই অস্বস্তিকর সেই দৃষ্টি, খানিকটা ভীতিকরও বটে...

"আচ্ছা, ওর বাবাকে ডেকে আনা যাবে?" মাদামের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মাদাম।

কিছুক্ষণ পরেই ঢুকলেন বাবা। উনার পিছে পিছে মাদাম।

"কী মনে হয় ডাক্তার সাহেব?" মৃদু হাসলেন তিনি, "শুধু শুধুই চিন্তা করছি, এমনটাই বলবেন তো তাই না? বোঝেনই তো... আশেপাশে কীসব হচ্ছে। তাই মেয়েটার জন্য চিন্তা হয়। আপনাকে ডেকে আনাটা মনে হয় বোকামিই হয়ে গেছে, তাই না?"

"একটু এদিকে আসুন, কথা আছে," গম্ভীর মুখের বললেন ডাক্তার সাহেব। বাবার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল!

একটু আগে আমরা যে জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন উনারা দুজন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন, দেখে মনে

হচ্ছিলো রীতিমতো তর্ক হচ্ছে! গ্রন্থাগারের ঘরটা বেশ বড়, অপর প্রান্তে উৎসুক ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি আর মাদাম; কিন্তু একটা কথাও কানে আসছিলো না, বেশ চাপা স্বরে আলাপ করছিলেন উনারা। ধীরে ধীরে আরো খানিকটা পিছিয়ে গেলেন দুজন, বড় জানালাটার খাঁজ ঘেঁষে দাঁড়ালেন ডাক্তার সাহেব, উনার সামনে বাবা। ডাক্তার সাহেবকে একেবারেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ধীরে ধীরে ডানের গলিটায় ঢুকে গেলেন উনারা। বাবার একটা হাত, কাঁধ আর মাথার পিছনের দিকটা দেখা যাচ্ছিলো।

অনেক চেষ্টা করলাম তাদের কথা শোনার, কিন্তু মোটা দেয়াল আর জানালার মাঝে যে কুলুঙ্গি রয়েছে তার জন্যই হয়তো কোনো কথাই আমাদের কানে এলো না।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন বাবা। উনার মুখটা ফ্যাকাশে, বিক্ষুদ্ধ... মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেছেন।

খানিকটা অবাক হলাম আমি, কী এমন বললেন ডাক্তার?

"লরা মা, একটু এদিকে এসো তো। মাদাম, ডাক্তার সাহেব বলেছেন আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই। দেখুন গিয়ে বাড়িতে সব ঠিক আছে না-কি," বলে উঠলেন বাবা।

এগিয়ে গেলাম আমি। এই প্রথম খানিকটা শঙ্কা ঘিরে ধরলো আমায়। হ্যাঁ, আমি অনেক দুর্বল হয়ে গেছি, কিন্তু কোনো ব্যথা তো নেই, তাহলে আবার কীসের অসুখ? একটু দুর্বল হয়েছি বলে কী হয়েছে? কত মানুষ দেখলাম! দেখে মনে হয় শরীরে একটু-আধটু শক্তিও নেই... পরে দেখা যায় তারাই ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু আসলে মনের ব্যাপার। মনের জোর সবচেয়ে বড় জোর।

এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরলেন বাবা। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত ডাক্তার, আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"কী বাবা?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"শোনো লরা, ডা. স্পিয়েলসবার্গের কিছু প্রশ্ন আছে তোমার কাছে। সব খুলে বলবে, কিচ্ছু লুকাবে না।"

"হুম!"

"আচ্ছা তুমি না-কি বলেছো, প্রথম যে রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিলে... তোমার গলার কাছে এক জোড়া সুচ ফুটে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা হয়েছিলো। কোনো ক্ষতচিহ্ন রয়েছে কি ওখানে?"

"না, নেই তো," অবাক হলাম আমি।

"আঙুল দিয়ে ওই জায়গাটা দেখাতে পারবে? যেখানে ব্যথা হয়েছিলো?" এগিয়ে এলেন ডাক্তার।

"এই যে এখানে, গলার একটু নিচে," আঙুল দিয়ে দেখালাম। জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছিলো আমার পরনের প্রাতঃকালীন পোশাক ।

"এবার বিশ্বাস হলো?" বাবার দিকে চেয়ে বললেন ডাক্তার। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা।

"আচ্ছা শোনো মা লরা," আস্তে করে বললেন ডাক্তার, "তোমার বাবা যদি তোমার পোশাকটা খানিক নামিয়ে জায়গাটা আমাকে দেখান, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে? মানে সত্যি বলতে কী, যে জায়গায় ব্যথা হয়েছিলো তা দেখা খুবই জরুরি।"

নীরবে মাথা নাড়লাম।

হাত দিলেন বাবা, কলার থেকে এক বা দুই ইঞ্চি নিচে জায়গাটা।

"হে ঈশ্বর! এ কী অবস্থা," রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠলেন বাবা। মুখটা আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল উনার।

"নিজের চোখেই তো দেখলেন?" মৃদু হাসলেন ডাক্তার।

"কী হয়েছে? দয়া করে আমাকে বলুন," প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম।

"তেমন কিছু না মা," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, "ছোট্ট দুটো গোলাকৃতির নীল ক্ষত, অনেকটা তোমার কড়ে আঙুলের ডগার মতো," বাবার দিকে ঘুরলেন তিনি, "ভাবছি। এখন কী করবো।"

"এটা কি কোনো খারাপ রোগের লক্ষণ?" কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম আমি।

"না তেমন কিছুই নয়," জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার, "ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। একটু সাবধানে থাকলেই খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে তুমি। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হও... আচ্ছা, ওইদিন তোমার শ্বাস নিতে খানিকটা কষ্ট হয়েছিলো, তাই না?"

"হ্যাঁ," ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে করার চেষ্টা করো তো, তুমি বলেছো না ওই অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলে তোমার মনে হয় ঠান্ডা পানির স্রোতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছো? ওই ঠান্ডা ভাবটা ওই জায়গাটা থেকেই শুরু হয়, তাই না? মানে ওটাই কেন্দ্রবিন্দু? ভালো করে ভেবে উত্তর দাও।"

"উমম... সম্ভবত তা-ই, ঠান্ডা ভাবটা ওখান থেকেই পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।"

"দেখলেন তো? আপনি তো শুরুতে কিছু বিশ্বাসই করতে চাইছিলেন না," বাবাকে বললেন ডাক্তার, "যাইহোক মাদাম পেরোডোনের সাথে কিছু বলা দরকার।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।"

পেরোডোনকে ডেকে আনলেন বাবা।

উনাকে ডাক্তার বললেন, "দেখুন মাদাম, আমাদের লরা মা কিন্তু বেশ অসুস্থ। যদিও ভয়ের তেমন কিছু নেই, তারপরেও আমাদের কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। আস্তে আস্তে সবই খুলে বলবো, তবে মাদাম লরা যেন মুহূর্তের জন্যও একা না থাকে। এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন! বর্তমানে এটাই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, কোনোভাবেই যেন এর অন্যথা না হয়।"

"আপনার প্রতি বিশ্বাস আছে মাদাম, দয়া করে আমার মেয়েটাকে কখনো একা ছাড়বেন না," বলে উঠলেন বাবা।

"অবশ্যই, আমি সবসময় ওর সাথে থাকবো," মাথা নাড়লেন মাদাম।

"বেশ বেশ," আমার দিকে ঘুরলেন বাবা, "লরা মা, শুনলে তো ডাক্তার সাহেব কী বললেন? উনার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন ডাক্তার সাহেব।

"ডাক্তার," বলে উঠলেন বাবা, "আরেকজনের ব্যাপারে আপনার সাথে কথা আছে। ওর অসুখের ধাঁচটাও খানিকটা লরার মতোই, তবে এতটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়নি মেয়েটা। মেয়েটা বয়সেও প্রায় লরারই সমান... আমাদের অতিথি আরকি। সন্ধ্যাবেলায় তো এই পথ দিয়েই ফিরবেন, তাই না? আবার একবার আসুন? এখানেই সন্ধ্যার নাস্তাটা করে, মেয়েটাকে একটু দেখে যাবেন? মেয়েটা আবার একটু অদ্ভুত ধরনের, দুপুরের আগ পর্যন্ত নিচেই নামে না।"

"আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ, স্যার," মাথা নাড়লেন ডাক্তার, "তাহলে সন্ধ্যা সাতটার দিকে আবার আসছি।"

বাবা আরেকবার মাদামকে মনে করিয়ে দিলেন যেন আমাকে কোনোভাবেই একা না ছাড়া হয়। তারপর বেরিয়ে গেলেন ডাক্তারের সাথে। উঁচু- নিচু রাস্তা দিয়ে, পরিখার ওপরের টানা সেতু পেরিয়ে সামনের ঘাস-জমির ওপর গিয়ে উঠলেন উনারা। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুজন, আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে একেবারেই মন নেই।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, তারপর দ্রুত চলে গেলেন পূর্বদিকের বনে। বাবা ফিরে আসতে লাগলেন প্রাসাদের দিকে।

ঠিক তখনই ড্রানফিল্ড থেকে চিঠি-পত্র নিয়ে একটা লোক এলো। বাবাকে দেখতেই লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে উনার হাত একটা থলে ধরিয়ে দিলো।

ততক্ষণে মাদাম আর আমি আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছি। ডাক্তার কেন আমাকে চোখে চোখে রাখতে বলে গেলেন? বাবাই বা কেন বিষয়টাতে অত জোর দিচ্ছেন? মাদামের মতে, ডাক্তার সাহেব ভয় পাচ্ছেন যে আমি খুব দুর্বল হয়ে গেছি, হুট করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে যদি আহত হই! এই জন্য সার্বক্ষণিক সঙ্গীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিংবা ঈশ্বর না করুক যদি মরেই যাই? সেজন্য আশেপাশে কেউ থাকলে ভয়টা একটু কম থাকে।

আমার তা মনে হয়নি। সম্ভবত আমার স্নায়বিক দুর্বলতা বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, সেজন্যই ডাক্তার সবসময় আমার সাথে এমন একজন সঙ্গীকে থাকতে বলেছেন। যে ভারী কাজ থেকে দূরে রাখবে আমায়... কাঁচা ফল খেতে মানা করবে... অথবা নানা রকমের উদ্ভট কাজকর্ম থেকে বিরত রাখবে, যেগুলো করে আমি মজা পাই আরকি।

জীবনটাই পানসে হয়ে গেল। মাদাম মানুষটা খুবই কড়া আর নিরস।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর একটা চিঠি হাতে প্রাসাদে ঢুকলেন বাবা।

"চিঠিটা অনেক দেরিতে এলো," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি, "জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফ পাঠিয়েছেন। যতদূর বুঝলাম উনার গতকালই আমাদের প্রাসাদে আসার কথা ছিলো... আজ যদি না আসেন তবে আগামীকাল অবশ্যই আসবেন। পথে কোনো কারণে দেরি হয়েছে হয়তো।"

চিঠিটা আমার হাতে দিলেন তিনি। বাবাকে খানিকটা হতাশ দেখাচ্ছে,

ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুতই। অতিথি আসার খবরে উনি কখনোই বিরক্ত হন না... আর তাছাড়া জেনারেল তো বাবার খুবই প্রিয় মানুষ!

জানালার দিকে মুখ ঘোরালেন বাবা। হুম, মানুষটা সম্ভবত একটু একা থাকতে চান। এই সময়ে জেনারেলের আসাটা হয়তো উনার ভালো লাগছে না। কোনো একটা ব্যাপার ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে উনাকে।

ডাক্তার উনাকে যা বলেছেন, সেই কথাগুলো? কী হয়েছে আমার? সবকিছু কেন খুলে বলছেন না বাবা?

"বাবা, শোনো... আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?" উনার কাঁধে হাত দিয়ে চোখে চোখ রাখলাম।

"অবশ্যই মা," আদর করে আমার মুখ থেকে খানিকটা চুল সরিয়ে দিলেন তিনি।

"ডাক্তার কী বলেছেন? আমার কি খুব খারাপ কোনো অসুখ হয়েছে?"

"না না, মা," ম্লান হাসি ফুটে উঠলো উনার মুখে, "উনি বলেছেন যথাযথ ব্যবস্থা নিলে তুমি আবার সুস্থ হয়ে যাবে। খুব বেশি না, দু-তিন দিনের মধ্যেই তোমার শারীরিক দুর্বলতা কেটে যাবে। জেনারেল আমাদের পারিবারিক বন্ধু... তারপরেও উনি এই সময়ে না এলেই ভালো হতো। তাই না? তুমি একদম সুস্থ হয়ে উনাকে অভ্যর্থনা জানাতে? ব্যাপারটা ভালোই হতো।"

"বাবা! তুমি কথা এড়িয়ে যাচ্ছো," দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "ডাক্তার আসলে কী বলেছেন? আমার সমস্যাটা আসলে কী?"

"দেখ এমনিতেই মাথায় অনেক চিন্তা, তার ওপর এসব প্রশ্ন করে আর বিরক্ত করো না," রীতিমতো রেগে উঠলেন বাবা! উনাকে এভাবে রাগতে আগে কখনোই দেখিনি।

খুব খারাপ লাগছিলো, মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

"আরে আরে মা," আমার হাতটা ধরে কপালে চুমু খেলেন বাবা, "মন খারাপ করলে না-কি? সবকিছু এক-দুদিনের মধ্যে তোমাকে খুলে বলবো। কিছুই লুকাবো না... একটু অপেক্ষা করো শুধু মা। এর মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না, মা।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী এমন কথা যা আমাকে দুদিন পর বলা যাবে কিন্তু এখন না?

প্রায় সাথে সাথেই আবার ফিরে এলেন বাবা।

"শোনো লরা," আমার হাত ধরলেন উনি, "কার্নস্টাইনে যেতে হবে। বারোটার মধ্যে কোচোয়ানকে গাড়ি ঠিক করে রাখতে বলেছি। তুমি আর মাদাম পেরোডোনও যাচ্ছো, ওখানকার গির্জার যাজকের সাথে ব্যাবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু আলোচনা আছে। জায়গাটা বেশ সুন্দর, গেলে তোমার মনটা ভালো হবে। লাফন্টেইনকে কিছু সরঞ্জাম নিতে বলেছি, উনিও যাচ্ছেন। ওখানকার পুরোনো ভাঙাচোরা দুর্গটায় আজ আমরা বনভোজন করবো, কেমন? কারমিল্লা যদি লাফন্টেইনের সাথে নিচে নামে তবে ওকে বলে দেখ, সে-ও চাইলে যেতে পারে আমাদের সাথে। এত সুন্দর জায়গা... ও হয়তো আগে দেখেওনি!"

বারোটার সময়ে জামা-কাপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি। কারমিল্লা নিচে নামলো না, মাদামোয়াজেল লাফন্টেইনেরও যাওয়া হলো না। বেশি দেরি না করে আমি, বাবা আর মাদাম রওনা দিলাম।

টানা সেতু পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা দিয়ে সেই গথিক ধাঁচের সেতুটার পশ্চিমে গিয়ে যাত্রা শুরু করলাম সেই পরিত্যক্ত গ্রামের উদ্দেশ্যে... যেখানে কার্নস্টাইনদের পুরোনো প্রাসাদ।

বনের ভেতরের যাত্রাটা ছিলো খুবই সুন্দর। গাড়ির জানালা দিয়ে এখান-সেখানের ছোট ছোট গাছপালা, মাঠ, দূরের পাহাড়, ছোট ছোট ঝোপঝাড়... সবকিছুই বেশ দেখা যাচ্ছিলো। কোথাও কৃত্রিমতার চিহ্নমাত্র নেই, যেন প্রকৃতিদেবী নিজ হাতে সবকিছুকে এঁকেছেন। পৃথিবীর বুকে যেন একটুকরো অপার্থিব আদিমতা এই অরণ্য।

উঁচু-নিচু জমি থেকে মাঝে মাঝেই রাস্তা সরে গেছে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে। পাহাড়ি গুহাগুলোর মুখ বড়ই রহস্যময়, ঠান্ডা বাতাস বইছিলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে। রাস্তা মাঝে মাঝেই বেঁকে গেছে।

এমনই এক বাঁকের মুখে আমাদের দেখা হয়ে গেল জেনারেলের সাথে। ঘোড়ার চড়ে আমাদের প্রাসাদের দিকেই যাচ্ছিলেন উনি, পিছনে আরেকটা ঘোড়ায় এক অনুচর। বেশ খানিকটা দূরে একটা ভাড়া করা ওয়াগনে উনার মালপত্র।

ওয়াগন দেখে খানিকটা অবাকই হলাম, এই অঞ্চলে মালপত্র সাধারণত

গরুর গাড়িতেই আনা-নেওয়া করা হয়।

দাঁড়িয়ে পড়লো আমাদের গাড়ি। বাবাকে খেয়াল করে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন জেনারেল। কিছু কথাবার্তা হলো তাদের মধ্যে। বাবা উনাকেও যেতে বললেন আমাদের সাথে, কার্নস্টাইনের দিকে যাচ্ছি শুনে উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

উনার চাকর, ঘোড়াদুটো আর ওয়াগন নিয়ে রওনা হলো আমাদের প্রাসাদে।

আর জেনারেল এসে বসলেন আমাদের গাড়িতে।

দশম অধ্যায়

শোকের গল্প



প্রায় দশমাস পর দেখলাম জেনারেলকে, কিন্তু মনে হচ্ছে এই অল্প সময়টাতেই যেন তার বয়স বহুগুণ বেড়ে গেছে। অনেক রোগা হয়ে গেছেন, চেহারাটাও বেশ গম্ভীর; সর্বদা হাসি-হাসি মুখটায় ভর করেছে রাজ্যের বিষণ্নতা। সুন্দর নীল চোখদুটোর প্রখরতা আর আগের মতো নেই, ঘন ভ্রুর নিচে যেন চাপা পড়ে গেছে ও দুটো।

গাড়িতে উঠেই জেনারেল বাবার সাথে নানান আলোচনায় মেতে উঠলেন। লোকটার কথাতে সেই পুরোনো সৈনিকোচিত ভাবটা এখনো রয়ে গেছে।

কথার সুর শুনেই বুঝতে পারলাম যে শারীরিক পরিবর্তনের জন্য শুধু মানসিক চাপ আর কষ্টই নয়, বরং উনার তীব্র ক্রোধও অনেকটাই দায়ী। ভাতিঝিকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন লোকটা, তার মৃত্যু এখনো মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রীতিমতো, "যে নারকীয় পিশাচদের লালসার শিকার হয়েছে আমার মেয়েটা, তাদের আমি ছাড়বো না! মাঝে মাঝে অবাক লাগে! স্বর্গের আত্মারা এমন অবিচার কী করে মেনে নেন? ঈশ্বর কেন এদের শেষ করে দেন না? আমার আশ্চর্য লাগে... সত্যিই আশ্চর্য লাগে! শেষ হয়ে যাক ওই অভিশপ্ত পিশাচেরা... আমার মতো হাজার হাজার অসহায় মানুষের অভিশাপ নেমে আসুক ওদের ওপর!"

এসব কী বলছেন জেনারেল? মেয়েটার জন্য শোক প্রকাশ বাদ দিয়ে কাদের অভিশাপ দিচ্ছেন?

বাবাও খেয়াল করলেন উনার অসংলগ্ন কথাগুলো।

"জেনারেল," একটু কাশলেন তিনি, "দেখুন আমি আপনার পুরোনো ক্ষত জাগিয়ে তুলতে চাইছি না... কিন্তু তারপরেও, একটু খুলে বলবেন? আপনার ভাতিঝির আসলে কী হয়েছিলো? ব্যাপারটা আমাদের জানা উচিত।"

"বলতে কোনো আপত্তি নেই," ম্লান হাসি ফুটে উঠলো জেনারেলের মুখে, "কিন্তু আপনি তো বিশ্বাস করবেন না।"

"কেন করবো না?" অবাক হলেন বাবা।

"কারণ আপনারা শিক্ষিত মানুষেরা বড্ড একগুঁয়ে," বিরক্ত কণ্ঠে বললেন জেনারেল, "নিজেদের সংস্কার আর বিশ্বাসের বাইরে কিছু মানতেই চান না। এককালে আমিও অমনই ছিলাম... কিন্তু এখন... অনেক কিছুই বুঝেছি। বুঝতে

বাধ্য হয়েছি।"

"বলেই দেখুন না," উত্তর দিলেন বাবা, "আমি অতটাও গোঁড়া নই, যতটা আপনি ভাবেন। আর তাছাড়া ভালো করেই জানি যে আপনি প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাই আপনার কোনো কথা শুনতেই আপত্তি নেই আমার।"

"ঠিকই বলেছেন, স্যার," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল, "যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না এমন কিছুতেই আমার বিশ্বাস ছিলো না... কিন্তু এখন... যা ঘটেছে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য! আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। কিন্তু তারপরেও ওসব আমাকে মানতে হয়েছে... হে ঈশ্বর! এক অতিপ্রাকৃত শক্তি আমাকে প্রতারিত করেছে!"

এসব কী বলছেন জেনারেল? বিচক্ষণ মানুষ তিনি, তার মুখে কি এসব মানায়? খেয়াল করলাম বাবাও অবাক দৃষ্টিতে উনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটা মানসিকভাবে সুস্থ তো?

জেনারেল অবশ্য উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমাদের কারো দিকেই তার খেয়াল ছিলো না। ব্যাপারটা ভালো, আমাদের দুজনের চোখে-মুখে যে সন্দেহ ফুটে উঠেছিলো তা দেখলে উনি আর যাইহোক, খুশি হতেন না!

"আচ্ছা আপনারা কার্নস্টাইন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের দিকে যাচ্ছেন না?" বলে উঠলেন জেনারেল, "কী সৌভাগ্য আমার। সত্যি বলতে কী, পথে দেখা না হলে, আপনার প্রাসাদে গিয়ে আমি নিজেই বলতাম আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য... ওখানকার কিছু বিষয় আমাকে পরখ করে দেখতে হবে। একটা পরিত্যক্ত গির্জা আছে না ওখানে? ওই গির্জার সাথের কবরস্থানেই রয়েছে, বিলুপ্ত কার্নস্টাইন বংশের লোকেদের কিছু সমাধিগৃহ।"

"হ্যাঁ তা তো বটেই," হাসলেন বাবা, "তা আপনি কি কোনোভাবে ওই বংশের উপাধি আর জমিদারি উদ্ধার করতে চান না-কি?"

কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিলেন বাবা। কিন্তু জেনারেল রীতিমতো গরম চোখে উনার দিকে উনার দিকে তাকালেন, সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে জগতের সব ক্রোধ, ঘৃণা আর বিদ্বেষ। খানিকটা চমকে গেলেন বাবা, জেনারেল তো কোনোকালেই এতটা অভদ্র ছিলেন না।

"আরে না না," দাঁতে দাঁত চেপে বললেন জেনারেল, "আমি যাচ্ছি সম্পূর্ণ

ভিন্ন কিছু করতে। কাজটা আপনার পছন্দ হবে বলে মনে হয় না। ওই তথাকথিত অভিজাত বংশের লোকেদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানার আছে আমার... ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওই অপবিত্র জায়গাটাকে পবিত্র করতে হবে, যাতে পৃথিবী মুক্তি পায় কতগুলো দানবের হাত থেকে... যাতে করে নিষ্পাপ মানুষেরা শান্তিতে ঘুমাতে পারে, আর যেন কেউ শিকার না হয় ওই শয়তানদের লালসার। প্রিয় বন্ধু, আপনাকে অনেক কিছুই বলার আছে আমার... এমন কিছু কথা যা ক-মাস আগে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না।"

বাবা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জেনারেলের দিকে, তবে সেই দৃষ্টিতে আর কোনো সন্দেহ নেই। মিশে আছে জিজ্ঞাসা আর শঙ্কা।

"অনেক আগেই কার্নস্টাইন বংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে," বলে উঠলেন তিনি "কমপক্ষে একশো বছর তো হবেই। আমার স্ত্রীও মায়ের দিক থেকে ওই বংশের রক্ত বহন করতেন। কিন্তু এখন আর কেউই বেঁচে নেই সম্ভবত ওই বংশের, পদবিটাও লোপ পেয়েছে। ভেঙে পড়েছে ওদের প্রাসাদ, গ্রামটাও পরিত্যক্ত, পঞ্চাশ বছর ধরে ওখানে কোনো বাড়িতে উনুন জ্বলেনি... বেশিরভাগ বাড়ির ছাদও পড়ে গেছে।"

"হুম কথা সত্য," মাথা নাড়লেন জেনারেল, "তবে আপনার সাথে শেষবার দেখা হওয়ার পর আমি অনেক কিছুই জেনেছি... অদ্ভুত সব ব্যাপার। শুনলে অবাক না হয়ে পারবেন না, ধীরে ধীরে সবই বলবো। আপনি তো আমার ভাতিঝিকে দেখেছিলেন... আহারে, কী সুন্দর ছিলো মেয়েটা। তিনমাস আগেও কী সুন্দর বেড়ে উঠছিলো বাছা আমার!"

"ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক," উনার কাঁধে হাত রাখলেন বাবা, "অমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। ওর মৃত্যুর খবর শুনে যে কী খারাপ লেগেছে, বলে বোঝাতে পারবো না। আ... আমি জানি এটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা আঘাত।"

জেনারেলের হাতটা ধরে চাপ দিলেন বাবা। বৃদ্ধ জেনারেলের চোখে নিজের অজান্তেই পানি চলে এলো। সেটা লুকানোর বিন্দুমাত্র প্রয়াস তিনি দেখালেন না।

"হুম, অনেক দিনের বন্ধু আমরা," কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন তিনি, "আমার দুঃখে আপনিও দুঃখিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমি তো

নিঃসন্তান, মেয়েটা ছিলো আমার বুকের ধন। নিজের সবটুকু স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে ওকে গড়ে তুলেছিলাম, সে-ও আমাকে নিজের বাবার মতোই ভালোবাসতো। আমার ঘর আলো করে ছিলো মেয়েটা... কিন্তু এখন? সব শেষ! হয়তো এই পৃথিবীতে আর বেশিদিন নেই আমি, বাঁচার ইচ্ছাটাও চলে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই... মরার আগে আমি প্রতিশোধ নেবোই, যাতে আর কোনো বাবার কোল এভাবে খালি না হয়। যে বয়সে আমার বাছার হেসে-খেলে বেড়াবার কথা ছিলো... সেই বয়সে ওকে যেতে হলো কবরে! ওকে যারা হত্যা করেছে সেই পিশাচদের আমি ছাড়বো না... কোনোভাবেই না!"

"আর বিলম্ব করবেন না জেনারেল," কেমন যেন চমকে উঠলেন বাবা, "দয়া করে খুলে বলুন আমাকে। অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছি আপনার কথাগুলোতে... বিশ্বাস করুন, শুধু কৌতূহল না... আরো একটা ব্যাপার আছে... সে কারণেই আমাকে সব শুনতে হবে!"

ততক্ষণে ড্রানস্টল রোডের মোড়ে এসে গেছি আমরা। এখান দিয়ে একটু ভেতরে ঢুকে বনের মধ্যে খানিকটা ঘুরে আমরা কার্নস্টাইনের দিকে যাবো।

"হুম, ওই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আর কত দূরে?" কেমন যেন উদ্বিগ্ন নজরে সামনের দিকে চাইলেন জেনারেল।

"এখনো প্রায় অর্ধ লিগ," উত্তর দিলেন বাবা, "আর দেরি করবেন না জেনারেল, সব খুলে বলুন, কী হয়েছিলো আপনার ভাতিঝির?"

একাদশ অধ্যায়

জেনারেলের কাহিনি



"হ্যাঁ বলছি বলছি।" একটু থামলেন জেনারেল, যেন সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন। এরপর যে কাহিনি উনি বলেছিলেন, ঈশ্বরের দোহাই... এমন রক্তজল করা অদ্ভুত কথাবার্তা আগে কখনোই শুনিনি, আর যেন কখনও শুনতেও না হয়!

"বেশ কয়েকদিন থেকেই আমার মেয়েটা অস্থির হয়ে ছিলো আপনাদের এখানে আসার জন্য," শুরু করলেন জেনারেল, "আপনার সুন্দরী মেয়ের সাথে কী কী করবে, কোথায় কোথায় ঘুরবে এসব নিয়ে বেচারির পরিকল্পনার অন্ত ছিলো না," তারপর মাথা নিচু করে সৈনিকদের ভঙ্গিতে আমাকে অভিবাদন জানালেন তিনি, বেচারা লোকটার চোখে-মুখে রাজ্যের হতাশা!

"তো এর মধ্যেই আমার পুরোনো বন্ধু কাউন্ট কার্লসফেল্ডের কাছ থেকে দাওয়াত পেলাম," বলে চললেন উনি, "কার্নস্টাইনের অপরপাশে প্রায় ছয় লিগ দূরে উনার প্রাসাদ। গ্রান্ড ডিউক চার্লস বেড়াতে এসেছিলেন প্রাসাদে, সেই উপলক্ষ্যেই দফায় দফায় বেশ কয়েকটা ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন ভদ্রলোক। মূলত সেজন্যই ডেকেছিলেন আমাদের। আপনিও হয়তো এই আয়োজনের কথা শুনেছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, এই অঞ্চলের মানুষ অনেকদিন আলোচনা করেছিলো ভোজসভাগুলো নিয়ে। বেশ জমেছিলো ওগুলো, তাই না?"

"একদম! পুরো রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপার! আর আতিথ্যের কথা কী বলবো! কোনো কিছুর অভাব ছিলো না, লোকটা আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে কি-না কে জানে? দিনগুলো ছিলো আনন্দে ভরা আর রাতগুলো পুরো রঙিন। ঠিক এমনই এক রাত আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলো আমার বাছাকে... যাইহোক, ওই রাতে আমরা সবাই নাচ-গানে মত্ত ছিলাম। পুরো বাগানেই চলছিলো আসর, গাছে গাছে রঙিন সব প্রদীপ। দামি দামি সব আতশবাজি ফাটানো হচ্ছিলো... বিশ্বাস করুন, অত দামি বাজি সম্ভবত প্যারিসেও পাওয়া যায় না। আর ছিলো গান-বাজনা, জানেনই তো চিরকাল এই জিনিসটার প্রতি আমি বেশ দুর্বল। সম্ভবত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সব অপেরা থেকে গায়ক আর যন্ত্রশিল্পীদের আনা হয়েছিলো... সে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। রীতিমতো মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিলাম আমরা। প্রদীপের আলোয় ঘেরা বাগানটাকে মনে হচ্ছিলো এক স্বপ্নরাজ্য, পূর্ণচন্দ্রের আলোতে ভেসে যাচ্ছে প্রাসাদের সব জানালা। প্রাসাদের পাশের হ্রদে নৌকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মানুষ, তারাও গলা মেলাচ্ছে

সুমিষ্ট গানের তালে... বাগানের প্রতিটি ঝোপ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো! আহা, সে কী পরিবেশ... মনে হচ্ছিলো যেন ফিরে গেছি যৌবনের সেই দিনগুলোতে... কত যে প্রেমের কবিতা আর গল্প পড়তাম... আহা, সেই দিনগুলো!

"বাজি পোড়ানো শেষ হওয়ার পর সবাইকে বল নাচের আসরে আমন্ত্রণ জানানো হলো। বিরাট হলঘরের পুরোটা জুড়েই চলছিলো নাচ। নাচের আগে সবাইকে মুখোশ* পরতে বলা হলো। সবাই মনের আনন্দে নেচে চলেছি... কী যে অপূর্ব দৃশ্য! বলে বোঝাতে পারবো না।

"আশেপাশে অভিজাত আর সম্ভ্রান্ত সব লোকজন, সবার রয়েছে নানান উপাধি... এদের সামনে আমি আসলে কিছু নই!

"আমার ভাতিঝি অবশ্য কোনো মুখোশ পরে ছিলো না। অপূর্ব সুন্দরী লাগছিলো ওকে। উত্তেজনা আর আনন্দ সেই সৌন্দর্যে যোগ করেছিলো নতুন মাত্রা। অনেকেই কথা বলতে আসছিলো ওর সাথে, হাসিমুখে সবার কথার উত্তর দিচ্ছিলো আমার মেয়েটা। তখনই খেয়াল করলাম ব্যাপারটা... ওর মতো বয়সিই একটা মেয়ে, পরনে বেশ দামি পোশাক... বারবার যেন তাকাচ্ছে আমার বাছার দিকে! ভালো করে তাকালাম, মেয়েটার মুখে মুখোশ, কিন্তু চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বোঝা যায় ও আমার ভাতিঝিকেই দেখছে। সন্ধ্যার সময়েও মেয়েটাকে হলঘরে দেখেছি। একটু আগেও যখন দুর্গের জানালার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম, সে-ও আমাদের আশেপাশেই ঘুরছিলো। তখনো ওর মুখে মুখোশ ছিলো! ওর থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো মধ্যবয়স্ক মহিলা, তার মুখেও মুখোশ, পরনের পোশাক যথেষ্ট অভিজাত। মহিলার পাশে একটা অদ্ভুত লোক, কেমন যেন আড়ষ্ট তার চলাফেরা... দেখে মনে হয় বড় কোনো জমিদারবাড়ির কর্মকর্তা।

"যাইহোক, অল্পবয়স্ক মেয়েটার দিকে আরেকবার তাকালাম। ওর মুখে যদি মুখোশ না থাকত তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে পারতাম যে ও আসলেই আমার ভাতিঝিকে দেখছে কি না।

* মুখোশ পরে ছদ্মবেশী নাচের ব্যাপক প্রচলন ছিলো তখন পূর্ব ইউরোপে। পরে পশ্চিম ইউরোপেও এই ধারা প্রচলিত হয়।

"তবে এখন আমি নিশ্চিত যে ওই মুখোশ পড়া মেয়েটা আমার সোনাকেই দেখছিলো!

"একটা বৈঠকখানাতে এলাম আমরা। সেখানেও চলছিলো নাচ, আমার ভাতিঝি নাচতে নাচতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, একটা চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো ও। আমিও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলো ওই দুজন মুখোশধারী নারী, যাদের কথা একটু আগে বলেছি। অল্পবয়স্ক মেয়েটা গিয়ে বসলো আমার মেয়ের পাশে। আর বয়স্ক মহিলা এসে দাঁড়াল আমার পাশে। তারপর অল্পবয়স্ক মেয়েটার কাছে গিয়ে ওর কানে ফিসফিস করে কীসব যেন বলে এলো।

"ফিরে এসে মুখোশ না খুলেই আমার সাথে গল্প শুরু করলো মহিলা। সে কী আন্তরিক ভঙ্গি! যেন আমাকে কতকাল ধরেই না চেনে! শুরুতে খানিকটা অবাক হলেও ধীরে ধীরে সামলে নিলাম ব্যাপারটা। এরপরেই খেলাম ধাক্কাটা! সে না-কি আমাকে অনেক আগে থেকেই চেনে! আগেও না-কি আমাদের দেখা হয়েছে একাধিকবার! কখনো কোনো রাজসভায় তো কখনো সম্ভ্রান্ত কোনো লোকের বাড়িতে... আমার জীবনের এমন কিছু ঘটনার কথা বললো যেগুলো এতটাই গুরুত্বহীন যে প্রায় ভুলেই গেছিলাম! ওর কথাতেই আবার মনে পড়লো! কিন্তু ওর সাথে আগে দেখা হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না! না-কি মুখোশ পরে থাকার কারণে তাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না?

"কে ও? কী করে চেনে আমাকে? বেশ কয়েকবার ইঙ্গিতে প্রশ্নটা করলাম। প্রতিবারই সযত্নে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল মহিলা। আমার ব্যাপারে যেসব কথা ও বলেছে, খুব পরিচিত কেউ না হলে সেগুলো জানার কথা না একেবারেই! ধীরে ধীরে বেড়েই চললো আমার কৌতূহল, কিন্তু মহিলা নিজের পরিচয় সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উত্তর দিলো না।

"ওই অল্পবয়স্ক মেয়েটা সম্ভবত মহিলার মেয়ে। বেশ কয়েকবার ওকে 'মিল্লারকা' নামেও ডেকেছে মহিলা। নামটা কেমন যেন অদ্ভুত! যাইহোক, আমার ভাতিঝির সাথে বেশ ভালোই গল্প জুড়েছে মিল্লারকা।

"পরে শুনেছিলাম মিল্লারকা, বার্থাকে বলেছে যে ওর মায়ের সাথে আমার বহুদিনের পরিচয়। ওর সাথে গল্পে এতটাই মজে গেছিলো আমার সোনা যে একবারও মিল্লারকাকে মুখোশ খুলতেও বলেনি সে। বার্থার পোশাক আর রূপের

এতটাই প্রশংসা করেছিলো মিল্লারকা, যে লজ্জায় লাল হয়ে গেল আমার বাছা। বলরুমে নাচতে থাকা লোকেদের নিয়ে নানান কৌতুক বলতে লাগলো মেয়েটা, হেসে ফেললো বার্থা। সে-ও মজা করে কয়েকটা কৌতুক বললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেল ওরা। তারপরেই ঘটলো সেই ব্যাপারটা... সেই যুবতী ধীরে ধীরে নিজের মুখোশটা খুলে ফেললো... আহা! কী সুন্দর যে মুখখানি! ওই প্রথম মিল্লারকার মুখ দেখি আমি। তবে মুখটা একেবারেই অপরিচিত, আমাদের এলাকার আশেপাশে কখনোই ওকে দেখিনি, পরে বার্থাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে-ও একই কথা বলেছে। কিন্তু মেয়েটা এতই সুন্দর... যে ওর দিকে একবার তাকালে আর নজর সরাতে ইচ্ছা হয় না! বেচারি বার্থাও অবাক চোখে ওকে দেখছিলো। সত্য বলতে কী, এত সুন্দর মেয়ে, জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি। যেন শিল্পীর তুলিতে ফুটে ওঠা একটা মুখ... এক অদ্ভুত আকর্ষণ... বার্থা যেন হারিয়ে গেল সেই অপার্থিব আকর্ষণের ফাঁদে!

"ওদিকে তখনো ওই বয়স্ক মহিলার সাথেই দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। সুযোগ পেয়ে তাকে আবার কতগুলো প্রশ্ন করলাম। কিন্তু এবারও বেশিরভাগ প্রশ্ন এড়িয়ে গেল সে।

"হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনি তো আমাকে অবাক করে দিয়েছেন! এতকিছু কী করে জানলেন আমার ব্যাপারে? কিন্তু আমি না আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি আমাকে চেনেন, কিন্তু আমি চিনি না... ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না? এক কাজ করুন, মুখোশটা খুলুন!'

"'আহা, এভাবে অনুরোধ করা অর্থহীন স্যার, একজন নারীর মুখ দেখার এত ইচ্ছা?' হাসল মহিলা, 'তাছাড়া কী করে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন? আমাদের শেষ দেখার অনেক বছর পেরিয়ে গেছে... বদলে গেছি দুজনেই! না-ও তো চিনতে পারেন!'

"'আচ্ছা আপনি যা ভালো বোঝেন,' বিষণ্ন হেসে মাথা নিচু করে মহিলাকে অভিবাদন জানালাম।

"'যেমনটা দার্শনিকেরা বলেন,' বলে উঠলো মহিলা, 'মুখ দেখে কি আর মানুষ চেনা যায়?'

"'তাই না? এই বিষয়ে একটা কথা না বললেই নয়,' হাসলাম আমি,

'আপনাকে আমার এত বয়স্ক মনে হয় না... মুখ না দেখলেও হাত তো দেখেছি...'

"'তাই? আমাদের শেষ দেখা হওয়ার পর বহু বছর কেটে গেছে স্যার। ওই দেখুন, আমার মেয়ে মিল্লারকা, অত বড় মেয়ের মা আমি... বুঝতেই পারছেন, কতটা বয়স আমার, যুবতী নই এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। যাইহোক, মুখোশ খুললেও আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আগেই বলেছি, আমরা দুজনেই অনেক বদলে গেছি। তাই শুধু শুধু ওটা খুলতে চাচ্ছি না।'

"'লেডি... আমি অনুরোধ করছি, মুখোশটা খুলুন,' মরিয়া হয়ে উঠলাম আমি।

"'আমিও অনুরোধ করছি, ওটা খুলতে আর অনুরোধ করবেন না। যেমন আছে, তেমনই থাকুক!' উত্তর দিলো সে।

"'আচ্ছা, তাহলে অন্তত এটুকু বলুন তো, আপনি জার্মান না ফরাসি? দুটো ভাষাই দেখছি বেশ ভালো বলতে পারেন!'

"'বাদ দিন জেনারেল, আপনি অনেক চালাক। ধীরে ধীরে সব কথা বের করতে চান, তাই না? উহুঁ, কোনোভাবেই আমার পরিচয় দেব না। শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছেন।'

"'হুম, আপনি যদি বলতে না চান, তাহলে আমার আর কিছুই করার নেই। তবে এটুকু জানা উচিত যে আপনাকে কী বলে সম্বোধন করবো? মাদাম কাউন্টেস?'

"হেসে ফেলল মহিলা। মনে মনে খুশি হলাম আমি, এবার বেশ ভালোমতোই ফাঁদে ফেলেছি তাকে। কয়েক মুহূর্ত একদম চুপ করে রইলো সে, নিশ্চয় প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার নতুন উপায় খুঁজছে! কিন্তু আমিও অত সহজে ছাড়ার পাত্র নই, যেভাবেই হোক কায়দা করে ওর পরিচয় আমি বের করবোই।

"'আচ্ছা শুনুন তবে,' বলতে শুরু করলো সে, ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক এসে হাত দিয়ে ইশারা করলো তাকে, লোকটার পরনে কালো সান্ধ্যকালীন পোশাক, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ... কোনো মুখোশ নেই চেহারায়... মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে। জীবন্ত মানুষের মুখ কখনো

অতটা ফ্যাকাশে হয়? মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে সে গম্ভীরমুখে মহিলাকে বললো, 'মাদাম কাউন্টেস, আপনার অনুমতি পেলে কিছু জরুরি কথা বলতে চাই।'

"মহিলা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করার ইশারা করল। তারপর আমাকে বললো, 'এখানেই থাকুন জেনারেল, আমার জায়গাটাতে কাউকে দাঁড়াতে দেবেন না। কিছু কথা বলে এখনই আসছি।'

"কালো পোশাক পরা সেই লোকটার সাথে এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ালো মহিলা। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম ওদের। মনে হচ্ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা চলছে, তারপর ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল তারা... কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে গেল তাতে! অনেক চেষ্টা করেও আর ওদের খুঁজে পেলাম না!

"হুম এই সুযোগে আমি খানিকটা মাথা ঘামাতে লাগলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম মহিলার সাথে আমার কোথায় দেখা হয়েছিলো? ওদিকে বার্থা আর মিল্লারকা সমানে গল্প করে চলেছে। যাই গিয়ে ওদের সাথে যোগ দিই, তারপর মিল্লারকার কাছ থেকে ওদের বংশ, প্রাসাদ, জমিদারি, পদবি সবকিছু জেনে নেবো... মহিলা ফিরে বেশ বড় একটা ধাক্কাই খাবে! কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এলো মহিলা, সাথে সেই লোকটা।

"মাদাম কাউন্টেস, তাহলে গাড়ি প্রস্তুত হলে আমি আপনাকে জানাচ্ছি," বলে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল লোকটা।

দ্বাদশ অধ্যায়

এক অদ্ভুত অনুরোধ



"'হুম,' মৃদু হাসলাম আমি, 'চলে যাচ্ছেন? তাহলে আমরা মাদাম কাউন্টেসের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি! আশা করছি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যই... তাই না?' বাউ করলাম আমি।

"'হতে পারে কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক সপ্তাহ? কে জানে?' মাথা নাড়লো মহিলা, 'খুব খারাপ একটা খবর পেলাম এইমাত্র। আচ্ছা যাইহোক, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?'

"'না মাদাম, পারিনি।'

"'চিনবেন চিনবেন,' কেমন যেন রহস্যময় গলায় বলে উঠলো সে, 'এখন না হলেও পরে তো ঠিকই চিনবেন। হয়তো আপনি যতটা ভাবছেন তার চেয়েও পুরোনো বন্ধু আমরা। এখন আর এসব নিয়ে বেশি কিছু না বলি, তিন সপ্তাহ পর আপনার অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদটার ওদিক দিয়েই ফিরবো আমি। জায়গাটা বেশ ভালোমতোই চিনি। যাইহোক, তখন এক-দুই ঘণ্টা আপনার প্রাসাদে কাটানোর ইচ্ছা আছে, আমাদের পুরোনো দিনগুলোর অনেক গল্প হবে। আমি নিশ্চিত, তখন আপনি আমাকে চিনবেনই! আসলে এত বাজে একটা খবর পেয়েছি ওই ব্যাপারে আর কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না... ব্যাপারটা অনেকটাই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আমার জন্য! এখুনি রওনা দিতে হবে, প্রায় একশো মাইলের মতো পথ, রাস্তাটাও বেশ ঘোরালো, সাথে অনেক কাগজ-পত্রও নিতে হবে। কী যে হবে কে জানে, চিন্তায় মাথাটা তেমন কাজ করছে না। আচ্ছা, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? যদি কিছু মনে না করেন? আমার বেচারি মেয়েটা খানিকটা অসুস্থ, শিকারে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছিলো তো... শরীর এখনো বেশ দুর্বল। মানসিকভাবেও প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে...ডাক্তার বলেছেন ওকে কয়েকমাস নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্রাম নিতে হবে, এছাড়া দীর্ঘ কোনো ভ্রমণেও যেতে মানা করে দিয়েছেন। এখানে আমরা খুব ধীরে ধীরে এসেছি, কোচোয়ানকে বলে দিয়েছিলাম আস্তে গাড়ি চালাতে। সত্যি বলতে কী, ও থাকলে এক দিনে ছয় লিগের বেশি দূরত্ব পার করা যাবে না! কিন্তু এখন... যেখানে যাচ্ছি ওখানে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে... সারা দিন-রাত গাড়ি চালাতে হবে... ওদিকে বেশ ভালোই একটা সমস্যা হয়েছে, জীবন-মরণ সমস্যা বলতে পারেন! ঝামেলাটা যত তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা যায় ততই ভালো, কী ঝামেলা সেই প্রশ্ন দয়া করে করবেন না। বললামই তো,

ফেরার সময়ে আপনার প্রাসাদে বসবো, তখন সব খুলে বলবো। এই তো মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ, তারপর আমাদের মধ্যে আর কিছুই গোপন থাকবে না! ওহ, বললাম না একটা অনুরোধ ছিলো?'

"তারপর মহিলা এক অদ্ভুত অনুরোধ করলো আমায়! এমন ফিসফিসে কণ্ঠে কথাগুলো বললো যেন কোনো অনুরোধ না... বরং গোপন বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ করছে!

"কথাগুলো বলতে বলতে বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলো। এত সাবধান হওয়ার কী আছে? অনুরোধটা হলো সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যেন আমি তার মেয়ের দায়িত্ব নিই! ওকে নিজের প্রাসাদে রাখি!

"ওই পরিস্থিতিতে অনুরোধটা বেশ অদ্ভুতই লেগেছিলো আমার, এ আবার কেমন কথা? এত তাড়াতাড়ি ওর মনে হলো যে মেয়েটা আমার কাছে ভালো থাকবে? কিন্তু মহিলার কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিলো যে আমি সরাসরি 'না' বলতে পারলাম না। আমি বেশ অতিথিপরায়ন মানুষ, কিন্তু মহিলাকে তো তখনো চিনতে পারিনি! ওর মেয়েকে রাখি কী করে? কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম, মহিলা কি আসলেই আমার পরিচিত? না-কি অন্য কোনো ব্যাপার আছে? ঠিক তখনই বার্থা এলো আমার কাছে, আমার কানে কানে বললো, 'শুনুন না, আমার নতুন বন্ধু মিল্লারকা কে আমাদের প্রাসাদে দাওয়াত দেবেন? ও গেলে খুব মজা হবে! আমিও বলেছি যেতে। কিন্তু ও বললো, যেতে তো চায়, কিন্তু মায়ের অনুমতি ছাড়া যাওয়া সম্ভব না ওর পক্ষে। ওর মাকেও ডাকুন না!'

"অন্য সময় হলে বার্থাকে বলতাম, 'একটু দাঁড়াও, আগে ওদের ভালো করে চিনে নিই।' কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার কী যে হয়েছিলো! এখনো বুঝি না। মিল্লারকার সুন্দর মুখখানি দেখে বারবার মনে হচ্ছিলো এ কোনো উচ্চবংশের মেয়ে না হয়ে যায় না। কথাবার্তাও যথেষ্ট মার্জিত মেয়েটার। আর ওর মা-ও তো চায় যে মেয়েটা আমার প্রাসাদে থাকুক। কী আর করা? ওর দেখাশোনার ভার নিয়ে নিলাম।

"কাউন্টেস ইশারায় ওর মেয়েকে ডাকলো। 'শোনো,' কোমল কণ্ঠে মেয়েটাকে বললো সে, 'খুবই জরুরি একটা কাজে ডেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। এখনই যেতে হবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত এই ভদ্রলোকের প্রাসাদে

তুমি থাকবে, ঠিক আছে? তুমি তো জানোই উনি আমাদের পূর্ব-পরিচিত। ভালোভাবে থেকো, কেমন?'

মন দিয়ে সব শুনলো মিল্লারকা।

"চুপচাপ সব শুনে গেলাম আমি। ব্যাপারটা ভালোই, আমার বার্থা কদিনের জন্য একজন সঙ্গী পাবে, কিন্তু তারপরেও... মনের ভেতরটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছিলো! মহিলাকে এখনও একদম চিনতেই পারিনি, বললেই চলে!

"এর মধ্যেই কালো পোশাক পরা ভদ্রলোকটি এসে মহিলাকে নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে মাথা নিচু করে আমাকে অভিবাদন জানালো।

"ভদ্রলোককে বেশ শিক্ষিত মনে হলো। এত শিক্ষিত অনুচর যে রাখে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় কাউন্টেসই হবে। আচ্ছা, মহিলা কি আসলেই কাউন্টেস? না-কি রাজপরিবারের সদস্য? কে জানে! সে জন্যই হয়তো পদবি বলছে না!

"'শুনুন স্যার,' যাওয়ার আগে বলল আমায়, 'আমাদের বংশ বা পদবি সম্পর্কে আমার মেয়েকে দয়া করে কোনো প্রশ্ন করবেন না। খানিকটা সমস্যা আছে, এসব ব্যাপারে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা কাউন্ট কার্লসফেল্ড সব জানেন, তবে উনাকেও মানা করে দিয়েছি যাতে কাউকে কিছু না বলা হয়।'

"'উনি জানেন?' অবাক হলাম আমি।

"'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল মহিলা, 'আমাদের বংশের কিছু সমস্যা আছে, তাই আমি বা আমার মেয়ে একদিনের বেশি এখানে নির্বিঘ্নে থাকতে পারবো না। প্রায় এক ঘণ্টা আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখোশটা খুলেছিলাম... আপনিও কাছেই ছিলেন। ভাবলাম তখনই আপনি আমার মুখ দেখে ফেলেছেন। তাই আপনার সাথে কথা বলতে এলাম। উদ্দেশ্য ছিলো আপনি যে আমার মুখটা দেখেছেন এটা কাউকে বলতে মানা করা... কিন্তু আপনি তো আমার মুখই দেখেননি! ব্যাপারটা বেশ ভালোই হয়েছে। যাইহোক, স্যার... আবার বলছি আমরা পূর্বপরিচিত। আমার বংশ? সেটাও বেশ সম্ভ্রান্ত। কিন্তু কিছু কারণে সব খুলে বলতে পারছি না। আমার মেয়েও বলবে না... তবে একটা ব্যাপার কি জানেন? ও না, খুবই বোকা। তাই কখনো যদি ভুল করে কিছু বলে ফেলতে চায়... দয়া করে মানা করে দেবেন! কথা দিন?'

"আমি আর কী করবো? কথা দিলাম!

"মিল্লারকার কানে কানে কীসব যেন বললো ওর মা, তাড়াহুড়ো করে দুবার

চুমু খেলো দুই গালে। তারপর সেই ফ্যাকাশে চেহারার ভদ্রলোকের সাথে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

"'চলুন পাশের ঘরে যাই,' বলে উঠলো মিল্লারকা, 'ওখানকার জানালা দিয়ে হলঘরের দরজাটা দেখা যায়। মায়ের গাড়িটাও ওখানে দাঁড়িয়ে... হাত নেড়ে উনাকে বিদায় জানাবো।'

"ওর কথামতো পাশের ঘরে গেলাম। একটা বেশ সুন্দর পুরোনো ধাঁচের ঘোড়ার গাড়ি... এবং প্রাচীন পোশাক পরা কিছু লোকজন। রোগা ফ্যাকাশে চেহারার সেই কালো পোশাক পরা ভদ্রলোককে দেখলাম একটা কালো আলখাল্লা মিল্লারকার মায়ের হাতে দিতে। সেটা পড়ে নিলো মহিলা, তারপর নিচু হয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানালো, করমর্দন করলো ওর সাথে। গাড়িতে উঠে বসলো মিল্লারকার মা, দরজা বন্ধ হওয়ার আগে লোকটা বেশ অদ্ভুতভাবে বেশ কয়েকবার মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো! এটা আবার কী ধরনের অভিবাদন? এমন তো আগে দেখিনি! দরজা বন্ধ হতেই তীরবেগে ছুটে চললো গাড়িটা।

"'চলে গেলেন মা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মিল্লারকা।

"'হুম, চলে গেলেন,' ওর সাথে গলা মেলালাম আমি। বারবার মনে হচ্ছিলো, কাজটা কি ঠিক হলো? একটা অচেনা মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে ফেললাম এভাবে! এখন কী হবে কে জানে?

"'উনি একবারও ওপরে তাকালেন না,' কাঁদো কাঁদো গলায় বললো মিল্লারকা।

"'উনি কী করে জানবেন যে তুমি জানালায় এসেছো?' মৃদু হাসলাম আমি, 'তাছাড়া তোমার মা হয়তো মুখোশটা খুলে ফেলেছিলেন গাড়িতে ওঠার পর... ওপরে তাকালে যদি কেউ মুখ দেখতে পায়?'

"দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকালো মিল্লারকা। আহা, কী সুন্দর একখানা মুখ। এ উচ্চবংশের মেয়ে না হয়ে যায়ই না। শুধু শুধু মনে খারাপ চিন্তা আসছে, ধুর। বার্থার সাথে ওর দিনগুলো ভালোই কাটবে।

"আবার মুখোশটা পরে নিলো মেয়েটা, ওর পাশে এসে দাঁড়ালো বার্থা। 'চলুন নিচে যাই, আবার নতুন বাজনা শুরু হয়েছে,' আহ্লাদি কণ্ঠে বলে উঠলো মিল্লারকা। খানিকটা অবাক হলাম, একটু আগেই না ওর মন খারাপ ছিলো?

যাইহোক, ছোট মেয়ে, এমনটা হয়ই। নিচের চত্বরে ফিরে গেল ওরা দুজন, আমি জানালার পাশের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিছুক্ষণ পরই ফিরে এলো ওরা। মিল্লারকা এত আন্তরিকভাবে কথা বলছিলো যেন সেই কবে থেকে চেনে আমাকে! চত্বরে নাচতে থাকা নানান লোকেদের ব্যাপারে কথা বলতে লাগলো ও, প্রায় সবাইকেই দেখি চেনে! আজব ব্যাপার! এত অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে এদের সবাইকে চেনে কী করে? হ্যাঁ, লোকগুলোর সম্পর্কে খারাপ কোনো কথা সে বলেনি... তারপরেও! ব্যাপারটা অদ্ভুতই। যাইহোক ওর কথা বলার ভঙ্গি বেশ অদ্ভুত... শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর লেগে যায়। কথার জাদুতে হারিয়ে গেলাম আমি আর বার্থা। যাক, আমার প্রাসাদের নিস্তব্ধ সন্ধ্যাগুলোকে ভালোই মাতিয়ে রাখবে এই মেয়েটা।

"ভোর পর্যন্ত চললো সেই নাচগান। মদ খেয়ে পুরো মাতাল হয়ে পুরোটা সময় নেচেছিলেন গ্র্যান্ড ডিউক, প্রধান অতিথিই যখন এমন করছে তখন বাকিরা আর কী করে বিছানায় যাবে? তাই প্রায় সবাই-ই সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত আসরে ছিলো।

"যাইহোক, সকালবেলা সবাই ফিরতে লাগলাম যার যার জন্য বরাদ্দকৃত ঘরে। বেশ ভিড় জমেছিলো প্রাসাদের গলিগুলোতে, এর মধ্যেই বার্থা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মিল্লারকা কোথায়?'

"'এ কী কথা! ও তোমার পাশে নেই?' অবাক হয়ে গেলাম আমি! 'আরে না, আমি ভেবেছিলাম ও আপনার পাশে আছে!' গলাটা কেঁপে উঠলো বার্থার। এভাবেই ওকে প্রথমবার হারাই আমরা!

"পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম ওকে, কিন্তু পেলাম না! কোথায় ও? হয়তো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে? কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে পাবে কী করে? হে ঈশ্বর! এখন কী হবে? আশেপাশে এত মানুষ, এত হৈ-চৈ... এর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

"মাথাটা ঘুরে উঠলো আমার! এ কী ভুল করলাম? একটা যুবতী মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছি কিন্তু তার পুরো নাম জানি না! ওদের বাড়ি কোথায়? ওর মা কোথাকার কাউন্টেস? কিছুই তো জানি না! তাহলে মিল্লারকাকে খুঁজে পাবো কী করে এখন? হে ঈশ্বর! কেন আমি নিলাম এই মেয়েটার দায়িত্ব? এখন

কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই তো প্রথমে আমাকে ওর 'উপাধি' জিজ্ঞাসা করা হবে!

"বেলা বাড়লো, আমি হন্যে হয়ে খুঁজেও ওর কোনো খোঁজ পেলাম না। তীব্র হতাশায় চুপচাপ ঘরের এক কোণে বসে রইলাম। পুরোটা দিন এভাবেই কেটে গেল। নাচ-গানের আসর তো চললো, কয়েকবার বারান্দায় গিয়ে দেখলামও... যদি মিল্লারকাকে পাই... কিন্তু পেলাম না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মেয়েটা। কয়েক জনকে বললাম ওর কথা, কিন্তু কেউই চিনলো না। এভাবেই কেটে গেল দিনটা!

"অবশেষে পরেরদিন দুপুর দুটোর সময় ওর খোঁজ মিললো। বার্থার ঘরে এসে একজন অনুচর জানালো যে একজন অল্পবয়স্ক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে অনুরোধ করেছে যে তাকে যেন জেনারেল ব্যারন স্পিয়েলসডর্ফ এবং তার মেয়ের* কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাদের কাছেই ওর মা ওকে রেখে গেছেন।

"মিল্লারকাকে ফিরে পেলাম আমরা। বারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম। ওর ভালো-মন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে ওর মাকে কী জবাব দিতাম?

"বার্থাকে এক অদ্ভুত কাহিনি শোনালো মিল্লারকা, নাচের আসর শেষের পর না-কি হুট করেই আমাদের হারিয়ে ফেলে ও। এখানে-ওখানে খুঁজতে থাকে, কিন্তু পায় না... অনেকক্ষণ খোঁজার পর ক্লান্ত হয়ে হয়ে পড়ে সে। তখনই নজর পড়ে গৃহরক্ষকের শোবার ঘরের দিকে... দরজাটা খোলা। একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়ে সে... তীব্র হতাশা আর ক্লান্তিতে কখন যে ঘুম এসে পড়ে তা ও নিজেও বোঝেনি। অসুস্থ শরীরের কারণে সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশিই ঘুম হয় তার। ঘুমের মধ্যে কী করে যে পুরো একটা দিন পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি... এখনো শরীর অনেক দুর্বল ওর।

"ওইদিনই মিল্লারকাকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরলাম। একজন সঙ্গী পেয়ে খুবই খুশি ছিলো আমার বার্থা মা, আমারও বেশ ভালো লাগছিলো।

---

* মিল্লারকা সম্ভবত ভেবেছিলো বার্থা, জেনারেলের মেয়ে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাঠুরে



"আর এখান থেকেই সমস্যার শুরু। এসেই মিল্লারকা আমাদের জানালো যে অসুস্থতার পর থেকেই ওর অবসাদের ভাবটা প্রচুর বেড়ে গেছে, মেয়েটার চলাফেরাতেও ছিলো প্রচুর জড়তা। দুপুর পেরিয়ে অনেকটা বেলা হওয়ার পরেই সে নিজের ঘর থেকে নিচে নামত। ঘুমানোর সময়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিত সে, দুপুরের খানিকটা পরে আমাদের দাসী গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেই তালা খুলত সে। দাসীর সাথেই সাজঘরে যেত, তারপর নিচে নামত। খুব ভোরবেলা না-কি বেশ কয়েকজন দাস-দাসী তাকে প্রাসাদের বাগানের মধ্যে ঘুরতে দেখেছে! আনমনে গাছগুলোর নিচ দিয়ে হেঁটে যেত সে, কেমন যেন ঘোরলাগা এক ভঙ্গিতে! এসব শুনে আমার মনে তীব্র বিশ্বাস জন্মালো যে মেয়েটার ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস আছে। একদিন কয়েকজন অনুচর সকাল সকাল আমার কাছে এসে বলেওছিলো যে মিল্লারকা বাগানে... আমি সাথে সাথে ছুটে গিয়েছি ওর ঘরে। কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ, এমনকি জানালাগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে ঘুমাত মেয়েটা। এসব নিয়ে ওকে বেশি প্রশ্ন করা যেত না, অল্পতেই কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ত মেয়েটা... অদ্ভুতভাবে কাঁপত। রহস্যটা দিন দিন ঘনীভূত হয়ে উঠলো, বাগানের ভেতর হেঁটে যাওয়া মেয়েটা যে মিল্লারকা সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ অবস্থায় ও বের হতো কী করে? সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? অত সকালে আমার প্রাসাদের কোনো দরজা বা বড় জানালা(যেগুলো দিয়ে মানুষ বের হতে পারে) খোলা হতো না! তাহলে ও বাইরে যেত কী করে?

"এই উদ্ভট পরিস্থিতির মধ্যেই আরেকটা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

"আমার সোনা মেয়ে বার্থার শরীরটা হুট করেই কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। দিন দিন কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগলো ও... নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে লাগলো ওর সুন্দর মুখটা... মাঝে মাঝেই ওকে দেখে চমকে উঠতাম।

"এই ব্যাপারে বেশ ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম ওকে। ও জানালো প্রতি রাতেই ওর একটা অদ্ভুত সমস্যা হয়! ব্যাপারটা শুরু হয় কয়েকটা দুঃস্বপ্ন দিয়ে... তারপর ধীরে ধীরে ওর মনে হতে থাকে মিল্লারকার মতো একটা আবছা ছায়ামূর্তি ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে... মাঝে মাঝেই অদ্ভুত আকৃতির বিড়ালের মতো একটা জন্তুতে রূপ নেয় সেই ছায়ামূর্তি, ঘুরঘুর করে

বিছানার আশেপাশে।

"এরপরেই অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ছেয়ে যায় ওর পুরো শরীর। কেমন যেন ঘোরলাগা এক অশুভ অনুভূতি... যেন বরফশীতল একটা পানির ধারা ওর বুকের ওপর দিয়ে ক্রমাগত বয়ে যায়, স্পর্শ করে ঠোঁট, নাক, কান... তারপরেই গলার একটু নিচে একজোড়া সুচ যেন একসাথে ঢুকে যায়, তীব্র একটা ব্যথার স্রোত ওঠে পুরো শরীরে। শুরুর কয়েকদিন এখানেই থেমে থাকত ব্যাপারটা... কিন্তু কিছুদিন পর খানিকটা বদলে গেল... গলার কাছের ব্যথাটা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই দম বন্ধ হয়ে আসে... কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও।

"বার্থার ধারণা ছিলো এই অদ্ভুত 'দুঃস্বপ্ন'র জন্য ও ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। আর এজন্যই ওর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

বৃদ্ধ জেনারেলের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলাম, মোটামুটি সমতল একটা রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিলো আমাদের গাড়ি। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট ঘাস গজিয়েছে। আর খানিকটা গেলেই সেই 'ছাদহীন বাড়িগুলোর গ্রাম'... যেখানকার কোনো চিমনি থেকে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে এক কণা ধোঁয়া বের হয়নি।

পাঠকেরা ইতোমধ্যেই বুঝে গেছেন যে জেনারেলের ভাতিঝির অসুখের লক্ষণগুলোর সাথে আমার অসুখটারও অদ্ভুত মিল... এ কী করে সম্ভব? উনার প্রতিটি কথা যেন তীব্র অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছিলো আমায়। তবে কী... আমাদের প্রাসাদেও এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে? হে ঈশ্বর! উনার সেই সুন্দরী অতিথির স্বভাবের সাথে যে আমার বান্ধবী কারমিল্লার স্বভাবেরও অনেক মিল!

ঠিক তখনই শেষ হয়ে গেল বনভূমি, আমাদের সামনে হাজির হলো এক অদ্ভুত দৃশ্য! আশেপাশে সব ছাদ আর চিমনি ভেঙে পড়া বাড়ি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো দুর্গের ভাঙা চূড়া আর কামান রাখার জন্য পাঁচিলের ওপর তৈরি বৃত্তাকার খাঁজগুলো। আশেপাশে অনেক লম্বা লম্বা গাছ, বাতাসে ক্রমাগত নড়ছে ওগুলো। যেন কোনো জীবন্ত প্রাণী... আমাদের দেখে ক্রমাগত থাবা নাচাচ্ছে!

পৌঁছে গেছি কার্নস্টাইনে।

সত্যিই কি এসেছি? না-কি পুরোটাই স্বপ্ন! কেমন যেন ঘোরের মধ্যেই

গাড়ি থেকে নামলাম। চুপচাপ এগিয়ে চললাম প্রাসাদের দিকে। কেমন যেন অপার্থিব এক নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে আমাদের। কারো মুখেই কোনো কথা নেই... যেন বাকশক্তিহীন একদল প্রেত ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে পৌঁছলাম কার্নস্টাইন প্রাসাদে। বড় বড় ঘর, উঁচু সব সিঁড়ি আর অন্ধকার কিছু বারান্দা!

"এটাই ছিলো কার্নস্টাইনদের প্রধান দুর্গ," অবশেষে বলে উঠলেন বৃদ্ধ জেনারেল, বিরাট একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামটাকে দেখতে লাগলেন তিনি, নিঃসীম বনভূমি ঘিরে রেখেছে পুরো জায়গাটাকে।

"বুঝলেন, স্যার," বাবার দিকে তাকালেন তিনি, "কার্নস্টাইনদের মতো অত্যাচারী পরিবার এই অঞ্চলে খুব কমই ছিলো, বহু মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ওদের হাত। এই প্রাসাদটাই ছিলো ওই শয়তানদের সকল নির্মমতার কেন্দ্র। ক... কিন্তু..." খানিকটা থামলেন তিনি, "কিন্তু মৃত্যুর পরেও যে ওরা নিষ্পাপ মানুষদের জীবন শেষ করে দেবে... তা আমি ভাবতেও পারিনি! মরে গিয়েও অসংখ্য মানুষকে নিজেদের বিকৃত লালসার শিকার বানিয়েছে ওরা। ওই দেখুন, ওটা কার্নস্টাইনদের পারিবারিক গির্জা।"

হাত দিয়ে উনি যে জায়গাটা দেখালেন সেই জায়গাটা বেশ ঢালু আর গাছপালায় ঢাকা। গাছের আড়ালে একটা গথিক ধাঁচের ভবন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"কুড়ালের শব্দ পাচ্ছেন?" বাবার দিকে তাকালেন উনি, "সম্ভবত ওখানে কেউ গাছ কাটছে! চলুন যাই। কার্নস্টাইন পরিবারের রহস্য সম্পর্কে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি... হয়তো ও আমাদের কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইনের কবরের খোঁজ দিতে পারবে। গ্রামের এই সাদা-সিধে লোকগুলো অভিজাত পরিবারগুলোর ইতিহাস বেশ ভালোই মনে রাখে। এখানেই অভিজাতদের সার্থকতা... এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু এদের কাহিনিগুলো ঘুরতে থাকে সাধারণ মানুষের মুখে।"

"শুনুন, আমাদের বাড়িতে না, কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইনের একটা আঁকা ছবি আছে, ওটা দেখবেন না-কি?" বলে উঠলেন বাবা।

"পরে দেখা যাবে বন্ধু, পরে," হাসলেন জেনারেল, "আর ছবি দেখার কী দরকার? আমি তো ওকেই দেখেছি। এখানে কেন এসেছি জানেন? এদের

গির্জাটা বেশ ভালো করে দেখতে হবে... কিছু ব্যাপার আছে।"

"কী! কাউন্টেস মিরকাল্লাকে দেখেছেন? বাস্তবে?" চমকে উঠলেন বাবা, "কী করে সম্ভব? উনি তো একশো বছরেরও বেশি সময় আগে মারা গেছেন!"

"হ্যাঁ, মারা তো গেছে, তবে মৃত্যু বলতে আমরা যা বুঝি... তেমনটা হয়নি ওর!"

"দেখুন জেনারেল," উনার চোখে চোখ রেখে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন বাবা, "আপনার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না আমি!" বাবার বিরক্তিটা বেশ আগে থেকেই লক্ষ করেছিলাম। বাবার কথা শুনে জেনারেল কিছুই বললেন না। রাগও করলেন না... চুপচাপ এগিয়ে গেলেন শুধু।

"হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবো না," গথিক সেই গির্জার উঁচু খিলানের নিচ দিয়ে যেতে যেতে আনমনেই বলে উঠলেন তিনি। এমন ধাঁচের খিলান এই অঞ্চলে আগে দেখিনি, বোঝাই যাচ্ছে বেশ প্রাচীন স্থাপনা।

"কিন্তু," কেমন যেন জেদি কণ্ঠে বলে উঠলেন জেনারেল, "অল্প যে কটা বছর বেঁচে আছি... প্রতিশোধ আমি নেবোই! মহান ঈশ্বরের কৃপায় আমরা জীবিত মানুষেরা এখনো ওই অপার্থিব পিশাচদের শেষ করার ক্ষমতা রাখি!"

"প্রতিশোধ? কীসের প্রতিশোধ?" বাবার কণ্ঠের বিরক্তি আরো খানিকটা বেড়েছে।

"আমি ওই পিশাচের শিরশ্ছেদ করতে চাই," দুই হাত মুঠো করে ফেললেন জেনারেল, প্রচণ্ড ক্রোধে ভয়ংকর লাগছিলো উনার বিকৃত মুখটা। নিস্তব্ধ সেই জায়গাতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো উনার কথাগুলো। মুঠো করা হাতদুটো উঁচু করে ঘোরাতে লাগলেন, যেন অদৃশ্য কোনো কুড়াল এসে ভর করেছে ওদুটোতে...

"এসব কী বলছেন জেনারেল!" হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন বাবা।

"বলছি! ওই পিশাচিনীর মাথাটা কেটে ফেলবো!"

"মাথা কেটে ফেলবেন!"

"একদম! কুড়াল... অথবা বর্শা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো সেই পিশাচিনীর ঘৃণ্য গলাটা! শুনবেন... আপনারা সবাই শুনবেন সেই শব্দ..." রাগে রীতিমতো কাঁপতে লাগলেন তিনি, তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললেন:

"এই ভেঙে পড়া কড়িকাঠটা এখনো বেশ শক্ত আছে। আপনার মেয়েটা

অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। ও একটু এখানে বিশ্রাম করে নিক। আমার কষ্টের কাহিনিরও আর বেশি বাকি নেই, আর কিছুটা বললেই শেষ হয়ে যাবে।"

কড়িকাঠটা দেখলাম। ঘাস গজানো গির্জার পথে বেশ অনেককাল ধরেই সম্ভবত পড়ে আছে ওটা। আরাম করে বসলাম, আসলেই খুব ক্লান্ত লাগছিলো। জেনারেল খানিকটা ভেতরে গিয়ে সেই লোকটাকে ডেকে আনলেন যার কাঠ কাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। পুরোনো দেয়ালের ওপর গজিয়ে ওঠা নানান আগাছা পরিষ্কার করছিলো সে।

লোকটা বেশ বয়স্ক, শক্তিশালীও... হাতের কুড়ালটা অনেক ভারী, দেখেই বোঝা যায়।

সে জানালো যে এই পুরোনো জায়গাটার কিংবদন্তিগুলো সম্পর্কে বিশেষ কিছু ওর জানা নেই। তবে বুড়ো এক বনরক্ষী আছে যে সবকিছু বেশ ভালো বলতে পারবে। দুই মাইল দূরে গির্জার যাজকের বাড়ি, ওখানেই গেছে বনরক্ষী লোকটা। কার্নস্টাইন প্রাসাদের প্রতিটি কোনা ওর চেনা। অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে সে লোকটাকে আধা ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, তবে আমাদের একটা ঘোড়া ওকে দিতে হবে।

"হুম তা তুমি কবে থেকে এখানে কাজ করছো?" প্রশ্ন করলেন বাবা।

"অনেকদিন থেকেই এখানে কাঠ কাটি, নানান আগাছা পরিষ্কার করি," গ্রাম্য উচ্চারণে বলে উঠলো লোকটা, "এখানকার প্রধান বনরক্ষীর অধীনে আমাদের কাজ আরকি। আমার বাবাও এই কাজ করতেন, তার বাবাও... অনেক পুরুষ ধরেই আমরা এখানে কাজ করি। এই গ্রামেরই একটা বাড়িতে ছিলো আমার পূর্ব-পুরুষদের বাস, দেখবেন বাড়িটা?"

"না তার আপাতত দরকার নেই," মাথা নাড়লেন জেনারেল, "আচ্ছা, গ্রামটার এই অবস্থা হলো কী করে? কেন চলে গেল এখানকার বাসিন্দারা?"

"প্রেতাত্মাদের ভয়াবহ উপদ্রব দেখা দিয়েছিলো, স্যার," ভয়ে ভয়ে বললো লোকটা, "কটাকে কবর খুঁড়ে খুঁজে বের করা হয়েছিলো, যাজক বিশেষ পদ্ধতিতে শনাক্ত করেছিলেন ওদের। তারপর আরকি... এমন হলে যা করতে হয়, সেটাই করা হয়েছিলো। কারো গলা কাটা হয়েছিলো, আবার কারো বুকে কীলক বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিলো... সবগুলো দেহকেই পুড়িয়ে দেয় গ্রামবাসী। কিন্তু ওদের অত্যাচার থামেনি... বহু গ্রামবাসী মরেছিলো শয়তানগুলোর হাতে।

"গ্রামবাসী আরো সচেতন হয়ে উঠলো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরাও যোগ দিলো ওদের সাথে। কত কবর যে খোঁড়া হয়েছিলো তার ইয়ত্তা নেই... প্রচুর ভ্যাম্পায়ারকে ওই সময়ে মেরে ফেলা হয়! এতকিছুর পরেও ওদের উপদ্রব থামানো যাচ্ছিলো না। অবশেষে এলেন এক মোরাভিয়ান অভিজাত ভদ্রলোক, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। গ্রামের অধিবাসীরা উনাকে ভ্যাম্পায়ারের উপদ্রবের কথা জানায়। ভদ্রলোক আবার এইসব পিশাচদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন। উনি সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রামবাসীকে মুক্তি দেবেন এই অত্যাচারী শয়তানদের হাত থেকে। তো তিনি করলেন কী, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সূর্য অস্ত যাবার একটু আগেই উঠে বসলেন গির্জার একটা মিনারের চূড়ায়। সেই রাতে আকাশে থালার মতো বিরাট একটা চাঁদ উঠেছিলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো গির্জার পাশের কবরস্থান। এই প্রাসাদের জানালা দিয়ে আপনারাও দেখতে পাবেন ওটা। তো যাইহোক, তিনি চুপচাপ খেয়াল রাখতে লাগলেন। হুট করেই একটা রক্তচোষা বেরিয়ে এলো কবর থেকে, তারপর যে কাপড়টা দিয়ে ঢেকে ওকে কবর দেয়া হয়েছিলো সেটা একপাশে রেখে উড়ে গ্রামের দিকে চলে গেল!

"ও চলে যেতেই ভদ্রলোক মিনার থেকে নেমে কাপড়টা নিয়ে* আবার ওপরে গিয়ে বসলেন। ভোরের একটু আগে ভ্যাম্পায়ারটা ফিরে এলো, কিন্তু কাপড়টা না পেয়ে সে পড়ে গেল বিপদে! ভালো করে তাকাতেই ওর নজর পড়লো মিনারের চূড়ায় বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে!

"দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভদ্রলোকের কাছে কাপড়টা ফেরত চাইলো সে। ভদ্রলোক ইশারায় ওকে বললেন মিনারে এসে কাপড়টা নিয়ে যেতে। তার কথা মেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো ভ্যাম্পায়ারটা... ভদ্রলোকও তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন, পিশাচটা পাঁচিলের কাছে পৌঁছতেই তিনি দিলেন এক কোপ... এতই জোরে আঘাতটা লেগেছিলো যে শয়তানটার মাথা প্রায় দু-ভাগ হয়ে গেল! গলা ফাটানো আর্তনাদ করে নিচের কবরস্থানে পড়ে গেল ব্যাটা। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আরেক কোপ মেরে ওর

* কিংবদন্তি আছে যে কাপড় দিয়ে ঢেকে কবর দেওয়া হয় সেটাকে খুলে রেখেই ভ্যাম্পায়ারদের শিকারে যেতে হয় এবং ওটা ছাড়া তারা কবরে প্রবেশ করতে পারে না।

মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন। পরের দিন ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী ওই রক্তপিশাচের দেহটাকে প্রথমে শূলে চড়ালো, তারপর পুড়িয়ে ফেললো!

"অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওই মোরাভিয়ান ভদ্রলোকই না-কি তৎকালীন গ্রাম প্রধানের অনুমতিক্রমে কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইনের মৃতদেহটা কবর থেকে সরিয়ে ফেলেন। কবরের ওপরের স্মৃতিস্তম্ভটাও তুলে ফেলেছিলেন, যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ জায়গাটা ভুলেই গেল।

"তুমি কি কোনোভাবে বলতে পারবে কাউন্টেসের প্রাক্তন কবর কোথায় ছিলো?" প্রশ্ন করলেন জেনারেল, কণ্ঠে অস্থিরতা।

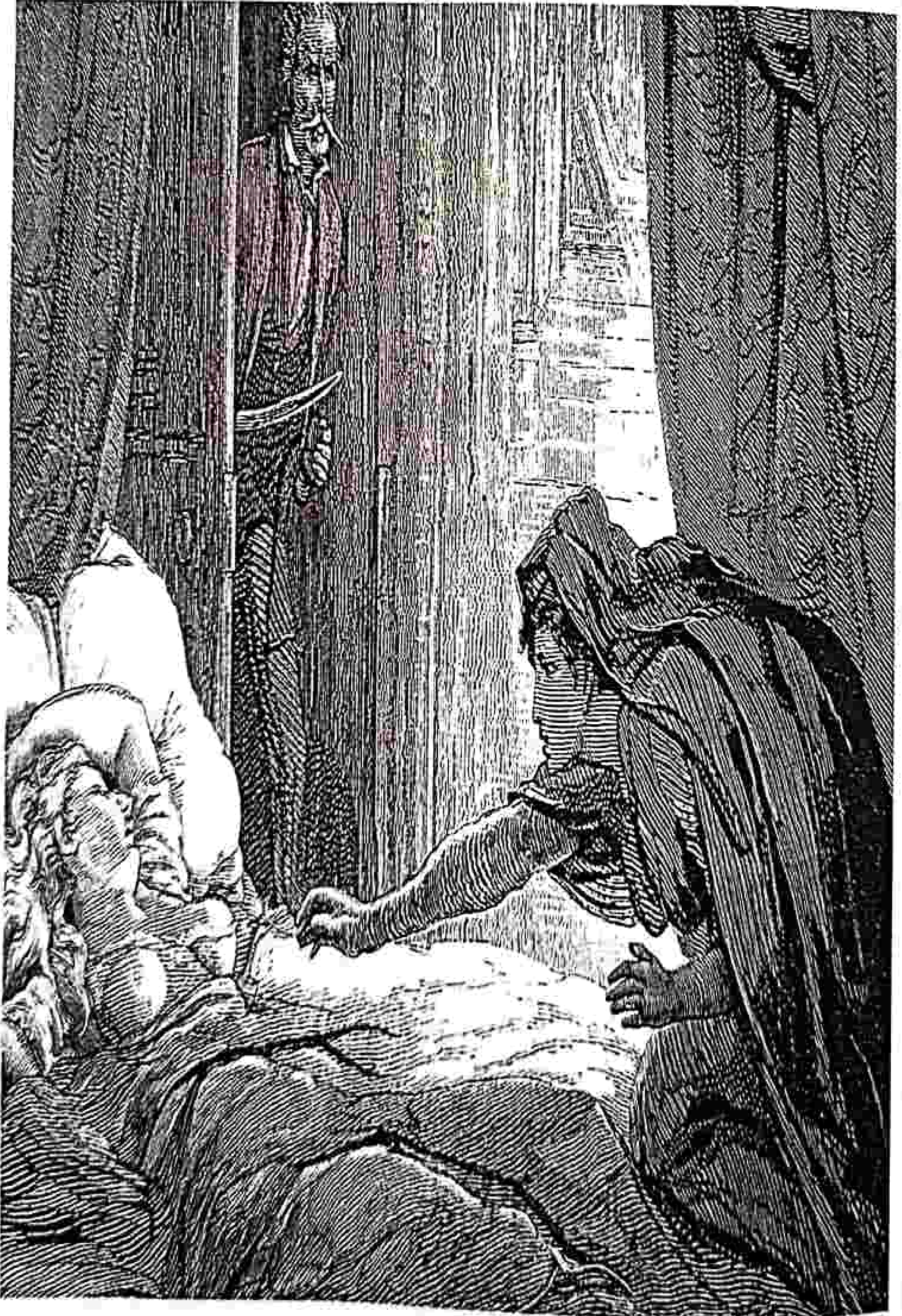
"না, স্যার," মৃদু হেসে মাথা নাড়লো লোকটা, "ওই কবরটা যে কোথায় ছিলো তা কেউই এখন আর বলতে পারবে না! তাছাড়া... লোকে বলে যে দেহটা কবর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে... কিন্তু আসলেই এমনটা হয়েছে না-কি তাও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না।"

আরো খানিকক্ষণ কথা হলো, তারপর কুড়ালটা মাটিতে রেখে ঘোড়ায় করে যাজকের বাড়িতে রওনা দিলো লোকটা।

ওদিকে আমি আর বাবা অপেক্ষা করতে লাগলাম জেনারেলের গল্পের বাকি অংশ শোনার জন্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

অবশেষে দেখা



"আমার মেয়েটা, আমার বেচারি মেয়েটা," রাজ্যের হাহাকার যেন ঝরে পড়লো জেনারেলের কণ্ঠে, "ওর অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হতে লাগলো। যে ডাক্তার ওকে দেখছিলেন উনি অসুখের কোনো কারণই খুঁজে পেলেন না! হতাশায় রীতিমতো ভেঙে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেব আরেকজন ডাক্তারের কথা বললেন। উনাকে আনতে গ্রেজে লোক পাঠালাম।

"উনার এসে পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেল। লোকটা বেশ বৃদ্ধ। দেখেই বোঝা যায় উনি সৎ, অনেক জ্ঞানী এবং ধার্মিক। আগের ডাক্তারকে সাথে নিয়েই বার্থার ঘরে গেলেন উনি। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলেন। গ্রন্থাগারে গিয়ে কীসব যেন আলোচনা করতে লাগলেন দুই ডাক্তার। পাশের ঘরে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম, বেশ জোরেই কথা বলছিলেন উনারা... কিন্তু যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তা মোটেই 'ডাক্তারি' ব্যাপার নয়!

বার্থার অসুখটাকে বেশ উদ্ভটভাবে ব্যাখ্যা করছেন গ্রেজ থেকে আসা ডাক্তার। ওদিকে উনার কথাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিচ্ছেন না আগের ডাক্তার, বরঞ্চ বারবার হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর গ্রন্থাগারের কড়া নাড়লাম। থেমে গেল তাদের আলোচনা।

"'ভেতরে আসুন,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন গ্রেজ থেকে আসা ডাক্তার।

"'বুঝলেন জেনারেল,' মৃদু হেসে বললেন আগের ডাক্তার, 'আমার বিজ্ঞ বন্ধুর ধারণা আপনার ডাক্তার নয়... বরং ওঝার দরকার।'

"'মাফ করবেন, স্যার,' বলে উঠলেন গ্রেজের বৃদ্ধ ডাক্তার, চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট, 'এই রোগ নিয়ে এখনই আপনাকে বিস্তারিত কিছু বলতে পারবো না, হয়তো ভবিষ্যতে কখনো বলা হবে। খুব খারাপ লাগছে, মঁসিয়ে জেনারেল... ডাক্তারিবিদ্যা বা আমার দক্ষতা এই ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসবে না। তবে যাওয়ার আগে একটা ছোটখাটো ব্যবস্থা করে যাবো...'

"গম্ভীর মুখে টেবিলে বসে কাগজে কীসব লিখতে লাগলেন তিনি।

"উনার কথাবার্তা শুনে আমার হতাশা আরো বেড়ে গেল। কোনোমতে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালাম উনাকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় খেয়াল করলাম, আগের ডাক্তার সাহেব খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন

যে বৃদ্ধ কী লিখছেন... মুহূর্তেই তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে... আপনমনেই হাত দিয়ে কপালে চাপড় মারলেন তিনি।

"এত বড় ডাক্তার ডেকে তাহলে লাভটা কী হলো? আনমনেই বাগানে এসে এদিক-সেদিক হাঁটতে লাগলাম। দশ-পনের মিনিট পর হুট করে পিছন থেকে কে যেন এসে আমার হাতটা ধরলো! চমকে উঠলাম... ঘুরে দেখি গ্রেজের সেই ডাক্তার।

"'অনেক দুঃখিত স্যার, এভাবে আপনার পিছু নেওয়ার জন্য,' মাথা নিচু করে বললেন তিনি, 'কিন্তু নীতিগতভাবে কিছু কথা আপনাকে জানিয়ে যাওয়া উচিত আমার। দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। বেচারি মেয়েটা কোনো সাধারণ অসুখে আক্রান্ত নয়... পৃথিবীর কোনো ডাক্তারই ওর রোগ ধরতে পারবে না... তবে... ও আর বেশিদিন নেই!'

"'কী বলছেন ডাক্তার,' চোখে পানি এসে গেল আমার।

"'হুম,' মাথা নাড়লেন তিনি, 'খুব বেশি হলে আর এক বা দুইদিন বাঁচবে ও। তবে হ্যাঁ... যে অপার্থিব শক্তির কারণে ওর এই অবস্থা, সেটাকে যদি কোনোভাবে রুখে দেয়া যায়... আর কয়েকমাস ভালোভাবে দেখে-শুনে রাখা হয় তবে বাঁচার সম্ভাবনা আছে! তবে ব্যাপারটা খুবই কঠিন... আর একবার... একবার যদি ওই রহস্যময় আক্রমণের শিকার হয় ও... তবেই নিভে যাবে জীবন-প্রদীপ।'

"'কী ধরনের আক্রমণের কথা বলছেন ডাক্তার? দয়া করে বলুন!' প্রায় কেঁদে ফেললাম আমি।

"'এই যে এখানে সব লেখা আছে,' বলে একটা চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি, 'কাছের কোনো গির্জা থেকে একজন যাজককে ডেকে, তার উপস্থিতিতেই এটা খুলবেন... কোনোমতেই যাজক ছাড়া এটা খুলবেন না... যা লেখা আছে তা আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তবে মনে রাখবেন, এটা জীবন-মরণ সমস্যা। যদি কোনোভাবেই যাজককে না পাওয়া যায়, তবেই আপনি এটা একা খুলতে পারেন।'

"'চিঠিটা পড়বেন, বুঝবেন... আর মনে রাখবেন প্রকৃতিতে এমন অনেক কিছুই ঘটে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। আর একটা কথা, এই ব্যাপারে সবাই তেমন বোঝে না। কোনো পদক্ষেপ নিলে কাউকে সাথে নিয়ে নেবেন।

আমারও সামান্য জ্ঞান আছে, তাই ভবিষ্যতে কখনো দরকার হলে ডাকতে পারেন।'

"যাজককে পাওয়া গেল না, তাই চিরকুটটা একাই খুললাম। অন্য সময় হলে আমি ওসব হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি কী করে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার বাচ্চা মেয়েটা! চিকিৎসাবিজ্ঞান অসহায়... তাই ভাবলাম যে শেষ একটা চেষ্টা করে দেখবো। যে করেই হোক মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে!

"ওই চিরকুটটা? হুম, শিক্ষিত কোনো মানুষ যে এমন কিছু লিখতে পারে তা আমার ধারণাতেও ছিলো না!

"অন্যসময় হলে বলতাম, 'এই লোক ডাক্তারি করে কী করে? এর তো পাগলাগারদে থাকা উচিত!'

"উনি লিখেছেন–

'মেয়েটার এই অবস্থার জন্য দায়ী একটা ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষা। গলার নিচের দিকে ছোট ছোট দুটো ফুটোর কথা ও বলেছে আমায়, সে দুটো আর কিছুই নয় বরং ভ্যাম্পায়ারের দাঁতের চিহ্ন!'

"স্তব্ধ হয়ে গেলাম! যাইহোক চিরকুটটা এখানেই শেষ হয়নি, উনি আরো লিখেছেন, 'ছিদ্র দুটোর ওপর আর নিচে নীল রঙের যে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে গেছে তা ভ্যাম্পায়ারের ঠোঁটের স্পর্শের কারণে হয়েছে। এই পিশাচদের দাঁত আর ঠোঁট বড়ই ভয়াবহ।' আরো লিখেছেন – 'মেয়েটাকে আমি ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, ওর বলা প্রতিটি লক্ষণ শুধুমাত্র একটা দিকেই ইঙ্গিত করে; ও ভ্যাম্পায়ারের লালসার শিকার। এভাবে অসুস্থ হয়ে অনেককেই মারা যেতে দেখেছি আমি, সেইসব ভুক্তভোগীদের উপসর্গের সাথেও আপনার ভাতিঝির উপসর্গগুলো মিলে যায়।' এরপর তিনি বিশেষ একটা উপায় অবলম্বন করে সেই ভ্যাম্পায়ারকে ঠেকানোর পরামর্শ দিয়েছেন!

"সত্য বলতে ভ্যাম্পায়ার বা এই ধরনের কোনো অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব কোনোকালেই বিশ্বাস করিনি। ডাক্তারের লেখাটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, সত্যিই কি এমন কিছু আছে? উচ্চশিক্ষিত একজন প্রসিদ্ধ মানুষ এসব কী করে লিখতে পারেন? তাহলে কি উনার এত বিদ্যা-শিক্ষা অসম্পূর্ণ? রক্তচোষাদের নিয়ে কিছু কাহিনি শুনেছিলাম, তবে সেগুলোর

বেশিরভাগকেই অসুস্থ মানুষদের মনের ভুল কিংবা রঙ চড়িয়ে বলা গল্প হিসাবে উড়িয়ে দিয়েছি! এখন কী করবো? কিছুই করার নেই, ডাক্তারের কথামতোই কাজ করতে হবে। মেয়েটাকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করে দেখবো। সেই 'ভ্যাম্পায়ার'-এর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব, যে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব নিয়েই আমি সন্দিহান!

"সেই রাতে বার্থার ঘরের সাথে লাগোয়া সাজঘরে লুকিয়ে রইলাম। ওকে বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছিলো, চুপচাপ শুয়ে ছিলো বাছা আমার... চোখে শূন্য দৃষ্টি। খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লো ও, বিছানার পাশের টেবিলে একটা মোম জ্বলছিলো। সাজঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, আয়নার সামনের টেবিলে রেখেছিলাম আমার বিরাট তলোয়ারটা! ঠিক সেভাবেই রয়েছিলাম যেভাবে ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন। চুপচাপ অপেক্ষা করছি। রাত একটার খানিকটা পর... মনে হলো ঘরের মেঝেতে বিরাট বড় কালো মিশমিশে বিড়ালের মতো জিনিস ঘুরে বেড়াচ্ছে... মুহূর্তেই বার্থার পায়ের কাছ দিয়ে বিছানায় উঠে পড়লো ওটা, বুকের ওপর চেপে বসলো বেচারির... ধীরে ধীরে নেমে এলো গলার কাছে... কেমন যেন ফুলে উঠলো ওটার শরীর, কাঁপতে কাঁপতে আরো খানিকটা বড় হয়ে গেল আকৃতি...

"বরফের মতো জমে গেছিলাম যেন! কিন্তু না... আর না, আর অপেক্ষা করা যাবে না!

"তলোয়ারটা নিয়ে তেড়ে গেলাম ওটার দিকে... মুহূর্তেই জিনিসটা যেন হাওয়ায় ভেসে বার্থার পায়ের কাছে চলে গেল... ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলো ওটার শরীর, হাওয়াতে ভেসেই বিছানা থেকে কয়েক ফুট দূরের মেঝেতে চলে গেল... তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো! তারপর যা দেখলাম... আমি কি সত্যিই ওই দৃশ্য দেখেছিলাম? দেখলাম কি জানেন? ওই কালো জিনিসটার জায়গায় মিল্লারকা দাঁড়িয়ে! লাফিয়ে গিয়ে তলোয়ারটা চালিয়ে দিলাম... কিন্তু কই মিল্লারকা? জায়গাটা তো ফাঁকা! ও চলে গেছে দরজার কাছে... একটুও আঘাত লাগেনি! ওর শরীর কি তবে রক্ত-মাংসের না? ভয় পেলেও ঘাবড়ে গেলাম না, তেড়ে গেলাম সেদিকে, আবার আঘাত করলাম... কিন্তু কোথায় মিল্লারকা? সে তো চলে গেছে! আমার তলোয়ারটা আটকে রয়েছে দরজায়!

"সেই রাতে আরো অনেক কিছুই হয়েছিলো," চোখ মুছলেন জেনারেল,

"সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। তাই সেদিকে আর যাচ্ছি না। বাড়ির সব লোকেদের ডেকে তুললাম, হৈ-চৈ শুরু হলো রীতিমতো... মিল্লারকাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না... কিন্তু ওর লালসার শিকার আমার বার্থা মা পড়ে ছিলো বিছানায়... মারা যাচ্ছিলো ও, অনেক চেষ্টা করলাম আমরা সবাই মিলে... কিন্তু ভোরের সূর্যের আলো আর জুটলো না পোড়াকপালীর ভাগ্যে... তার আগেই মারা গেল সে!"

আবার চোখ মুছতে লাগলেন জেনারেল। আমরা সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছি। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে কবরস্থানের স্মৃতিস্তম্ভগুলো পড়তে লাগলেন বাবা। তারপর গেলেন গির্জার ডানপাশের দরজাটার দিকে, ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন জায়গাটা। দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জেনারেল, চোখদুটো ভেজা... কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে একদম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ঠিক তখনই কারমিল্লা আর মাদামোয়াজেলের কণ্ঠ শুনতে পেলাম!

তাহলে ওরাও এসে গেছে? যাক যাক, বেশ ভালো লাগলো। এই গুমোট পরিবেশে দুটো কথা বলার একজন সঙ্গীর খুব দরকার আমার। ধীরে ধীরে কাছিয়ে আসতে লাগলো ওদের কথাগুলো।

প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছিলো। আশেপাশে সব সম্ভ্রান্ত মানুষদের কবর, এরাও এককালে জীবিত ছিলেন! উনাদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এই কবরস্থানের প্রতিটি ধূলিকনাতে। কিন্তু তারচেয়েও অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো জেনারেলের ভাতিজির অসুখের সাথে আমার অসুখের ব্যাপারটা যে অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে... আশেপাশে তাকালাম, পরিবেশটা কেমন যেন নিস্তব্ধ, আধো-অন্ধকার, আইভিলতায় ঢাকা দেয়ালগুলোর ওপর সূর্যের আলো পড়ে কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

এই অশুভ পরিবেশটা যেন এক অপার্থিব প্রভাব ফেলছে আমার ওপর, মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো! অদ্ভুত এক ঘোরে ডুবে যাচ্ছিলাম যেন, ইশশশ, কারমিল্লা তাড়াতাড়ি এসে গেলেই হয়!

জেনারেল এখন একটা ভাঙা স্মৃতিস্তম্ভের ওপর হাত রেখে এক দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমার চোখ পড়লো একটা খিলানের ওপর, কেমন যেন অদ্ভুত সব কারুকার্য করা রয়েছে তাতে। সম্ভবত পুরোনো গথিক চিত্রকলা। বাপরে বাপ,

এতই ভয়ংকর যে তাকালেই বুকটা ধক করে ওঠে। ঠিক তখনই ছায়াঘেরা গির্জার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলো একটা সুন্দর মুখ... আমার বান্ধবী কারমিল্লা! এই অসুন্দর পরিবেশে ও যেন বড়ই বেমানান!

আমাকে দেখেই মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। আমিও হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। ওকে কিছু বলতে যাবো... ঠিক তখনই আর্তনাদ করে উঠলেন জেনারেল! মাটি থেকে সেই কাঠুরের রেখে যাওয়া কুড়ালটা তুলে নিয়ে সামনে দৌড়ে গেলেন তিনি! হুট করে কী হলো লোকটার? উনাকে দেখতে পেয়েই কারমিল্লা কেমন যেন চমকে গেল, ভয়ংকর নির্মমতা ফুটে উঠলো ওর সুন্দর চেহারাটায়... একদম বিড়ালের মতো গুড়ি মেরে পিছিয়ে গেল সে! এ আমি কী দেখছি? যে মেয়েটার এখান থেকে ওখানে যেতে অলসতা লাগে, সে এত তাড়াতাড়ি নড়া-চড়া করতে পারে?

খানিকটা লাফিয়ে উঠে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে কুড়ালটা ওর দিকে চালিয়ে দিলেন জেনারেল! বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলাম আমি... কিন্তু ঠিক সেভাবেই গুড়ি মেরে মাথা নিচু করে আঘাতটা এড়িয়ে গেল কারমিল্লা!

এরপর?

আমার চোখের সামনেই ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। এগিয়ে এসে নিজের ছোট্ট হাতটা দিয়ে বিশাকৃতির মানুষটার হাত চেপে ধরলো কারমিল্লা! নিজের হাত ছাড়ানোর জন্য রীতিমতো ছটফট করে উঠলেন জেনারেল, কুড়ালটা পড়ে গেল উনার হাত থেকে... কিন্তু কারমিল্লা কই? যে জায়গাটায় ও দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে কেউ নেই!

রাগের চোটে দেয়ালে ধাক্কা দিলেন জেনারেল! দাঁড়িয়ে গেছে উনার মাথার সমস্ত সাদা চুল, ঘেমে উঠেছে মুখটা... অপার্থিব এক আতঙ্ক লোকটার চোখে-মুখে, যেন কয়েক মুহূর্ত আগে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছেন তিনি!

এভাবেই কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। এরপর কী হয়েছিলো? সবটা মনে নেই।

শুধু এটুকু মনে আছে যে আমার সামনে অবাক চোখে দাঁড়িয়ে আছেন মাদাম পেরোডোন আর বারবার বলছেন, "মাদামোয়াজেল কারমিল্লা কোথায় গেলেন? এখানেই তো ছিলেন!"

"আ... আমি জানি না... বলতে পারবো না... ও... ওদিকে গেছে,"

অবশেষে একটা দরজার দিকে আঙুল তুললাম আমি, ওটা দিয়েই সম্ভবত মাদাম ঢুকেছেন এক বা দুই মিনিট আগে। আমি, বাবা আর জেনারেল যখন কথা বলছিলাম তখন তিনি ওদিকে দিয়ে বেরিয়ে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।

"আমি তো ওই গলিতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার সামনে দিয়েই ঢুকলেন, বেরিয়ে যেতে তো দেখিনি," অবাক হয়ে উত্তর দিলেন মাদাম।

মাদামোয়াজেল ডি লাফন্টেইনও এসে গেছেন ততক্ষণে। তিনিও অবাক!

"কারমিল্লা... কারমিল্লা," বলে জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে তিনি গলিতে ঢুকে পড়লেন। গলির প্রতিটি জানালা, দরজাতে ডেকে চললেন কারমিল্লার নাম ধরে... কিন্তু কোনো উত্তর এলো না!"

"আচ্ছা, এখানে ও নিজের নাম 'কারমিল্লা' বলেছে, তাই না?" হুট করেই আবার রেগে উঠলেন জেনারেল।

"হুম, ওটাই ওর নাম," উনার মুখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলাম আমি।

"না," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন উনি, "ও-ই হলো মিল্লারকা, এটাও অবশ্য মিথ্যা নাম। আসলে ওই হলো কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইন... শত বছর আগে ওকে এই নামেই ডাকা হতো। মা, আমার কথা শোনো, তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাজকের বাড়ি চলে যাও, এই অভিশপ্ত এলাকাতে থাকার কোনো দরকার নেই। আমরা না আসা পর্যন্ত ওখানেই থেকো... যাও, দেরি কোরো না। আর কারমিল্লা? ঈশ্বরের কৃপায়, ওর সাথে যেন তোমার আর কখনো দেখা না হয়... ওকে আর এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না..."

পঞ্চদশ অধ্যায়

কবরের খোঁজ, অতঃপর শিরশ্ছেদ



জেনারেলের কথা শেষ হতে না হতেই দৃশ্যপটে প্রবেশ করলেন এক অদ্ভুতদর্শন লোক, সেই দরজা দিয়ে যেটা দিয়ে একটু আগে কারমিল্লা ঢুকেছিলো আবার বেরিয়েও(!) গেছে। বেশ লম্বা উনি, বুকটা বেশ চাপা, কেমন যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে মাথা, চওড়া কাঁধ, পরনের পোশাক মিশমিশে কালো। রোদে পোড়া বাদামি মুখটা অসংখ্য কুঞ্চিত রেখায় ভরতি। মাথায় কেমন যেন অদ্ভুত একটা হ্যাট, ওটার এক কোনাতে অজানা কী একটা গাছের পাতা গুঁজে রাখা, বেশ চওড়া পাতাটা। মাথাভরতি লম্বা ধূসর চুল কাঁধ ছাড়িয়ে আরো খানিকটা নেমে গেছে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাঁটার ভঙ্গি কেমন যেন অদ্ভুত। মনে হচ্ছে অপার্থিব কোনো শক্তি এগিয়ে নিয়ে চলেছে উনার পা দুটোকে। মাথা নিচু করে আমাদের অভিবাদন জানালেন তিনি, মুখে মৃদু হাসি। হাঁটার সময়ে দুলছিলো লম্বা-পাতলা বাহুদুটো, হাতের কালো দস্তানা জোড়া একটু বেশিই ফাঁপা, ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছিলো!

জেনারেলের দিকে হাত নাড়িয়ে অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত করলেন সেই ভদ্রলোক।

"অবশেষে এলেন!" হাসি ফুটে উঠলো জেনারেলের মুখে, লোকটার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি, "মহামান্য ব্যারন! আপনাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না! এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হবে ভাবিনি।"

বাবাকে ডাক দিলেন জেনারেল। কাছেই ছিলেন উনি। বাবার সাথে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্যারন তো অনেক বড় উপাধি! এই লোকটাকে দেখে বোঝাই যায় না এত অভিজাত ঘরের মানুষ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন উনারা। পকেট থেকে একটা কাগজের রোল বের করে সেটাকে পাশের একটা কবরের ওপর বিছিয়ে দিলেন ব্যারন। তারপর আরেক পকেট থেকে বের করে আনলেন পেনসিল। বাবা আর জেনারেলকে কীসব বোঝাতে বোঝাতে ওই কাগজে কয়েকটা রেখা টানলেন তিনি, খানিকটা এগিয়ে গেলাম। ভালো করে দেখলাম কাগজটা, সম্ভবত এটা এই গির্জার নকশা।

কিছুক্ষণ পর উনার পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বের হলো। বেশ ছোট্ট একটা বই, ময়লা আর হলদেটে হয়ে গেছে ওটার পাতাগুলো, ওতে

লেখাগুলোও কেমন যেন ঠাসা-ঠাসা; একটুও বাড়তি জায়গা নেই।

বাবা আর জেনারেলকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বইটা থেকে কিছু পড়ে শোনালেন উনি। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার অপরদিকের একটা গলিতে ঢুকলেন উনারা। গলির মধ্যে বেশ কয়েকটা স্তম্ভ। হাঁটতে হাঁটতেও নানান কথা বলে চলেছেন তারা, মাপ-জোক করে দেখছেন এখানে ওখানে। অবশেষে একটা দেয়ালের সামনে গিয়ে তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা হলো জায়গাটা, সেখান থেকে একটানে আইভিলতাগুলো উপড়ে ফেললেন জেনারেল। তারপর একসাথে তিনজন মিলে লাঠি দিয়ে খোঁচাতে শুরু করলেন জায়গাটা... কিছুক্ষণের মধ্যেই খসে গেল প্লাস্টার।

সাহস করে আমিও একটু এগিয়ে গেলাম।

একটা মার্বেল পাথরের চওড়া ফলক বেরিয়ে এসেছে দেয়ালের আড়াল থেকে... ওতে কীসব যেন লেখা!

সেই কাঠুরে ফিরে আসার পর* ওর সাহায্য নিয়ে দেয়ালের আরো খানিকটা প্লাস্টার সরিয়ে সেই ফলকের পুরোটা এবং কার্নস্টাইন বংশের প্রতীক আঁকা একটা স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গেল। কারোরই বুঝতে বাকি রইলো না যে এটাই বহুকাল আগে লুকিয়ে ফেলা কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইনের সমাধি!

আকাশের দিকে তাকালেন জেনারেল, তারপর হাতদুটো তুলে নীরবে ধন্যবাদ জানালেন মহান ঈশ্বরকে। কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

"আগামীকাল," অবশেষে বলে উঠলেন তিনি, "এই অঞ্চলে নিযুক্ত সরকারি প্রতিনিধি আসবেন। উনার উপস্থিতিতেই আইন অনুযায়ী সবকিছু হবে।"

তারপর করমর্দন করলেন সোনার চশমা পরা ভদ্রলোকের সাথে, "ব্যারন, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই! আপনার প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলকে যে

---

* লেখক এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করেননি, কাঠুরে যাজককে আনতে গেছিলো, কিন্তু সে একা ফিরলো কেন? বিশেষজ্ঞরা ধরে নেন যে কোনো কারণে সে যাজককে পায়নি। ব্যারনকে ঠিক কে খবর দিয়েছিলো তা-ও পরিষ্কার করা হয়নি।

অপার্থিব বিভীষিকা তাড়া করে ফিরছে... তাকে শেষ করার সময় এসেছে এবার। আপনি না থাকলে কোনোভাবেই এই সমাধি খুঁজে পেতাম না আমরা... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!"

বাবা ব্যারনকে একপাশে ডেকে নিলেন। জেনারেলও গেলেন ওদিকে। উনাদের কোনো কথাই আর শুনতে পাবো না।

বুঝতে পারলাম আমার অসুখের ব্যাপারটা উনাদের খুলে বলা হবে। বলতে শুরু করলেন বাবা। কিছুক্ষণ পরপরই আমার দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছিলেন জেনারেল আর ব্যারন!

যা ভেবেছিলাম তা-ই।

ফিরে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন বাবা। চুমু খেলেন দুই গাল আর কপালে। গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

উনি বললেন, "বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, মা। কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে হবে। কাছেই একজন খুব ভালো যাজক* রয়েছেন। উনাকে নেবো আমাদের সাথে, যেভাবেই হোক উনাকে আমাদের প্রাসাদে কয়েকদিন থাকার জন্য রাজি করাবো আমি!"

রাজি হলেন যাজক। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরলাম সবাই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেন যেন খুব ভালো লাগছিলো। বাড়ি ফিরতেই চাকর-বাকরেরা বাবাকে জানালো যে কারমিল্লাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না! বাবা তেমন অবাক না হলেও আমি চমকে উঠলাম!

কেন চমকালাম? এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিলো, তাই না? তাহলে কি আমার অবচেতন মনের একটা অংশে এখনো এই সম্ভাবনা বাকি ছিলো যে, 'কারমিল্লা আসলে মিরকাল্লা নয়?' ওই অপার্থিব দৃশ্য দেখার পরেও!

মানুষের মন আসলে বড়ই অদ্ভুত।

বাবাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, গির্জা থেকে কারমিল্লা অত তাড়াতাড়ি বের হলো কী করে? কোথায় গেল ও? চুপচাপ প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলেন উনি।

বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা নিয়ে বাবা একেবারেই আলোচনা করতে চাইছেন না আমার সাথে।

---

* এখানে কাহ্নরে যে যাজককে আনতে গেছিলো তার কথা বলা হচ্ছে কি-না সেটাও পরিষ্কার করেননি লেখক।

বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেই ভয়ংকর দৃশ্য! কী করে কারমিল্লা নিজের রোগা-পাতলা হাতটা দিয়ে ধরেছিলো জেনারেলের হাত... তারপরে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে!

ভয় পাচ্ছিলাম... অনেক ভয়!

সে রাতে বাবা বিশেষ ব্যবস্থা নিলেন। মাদাম পেরোডোন আর দুজন অনুচরকে বললেন আমার বিছানার পাশে বসে থাকতে। উনি আর যাজক সাজঘরে বসে খেয়াল রাখবেন।

পুরো ঘরজুড়ে অদ্ভুত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করলেন যাজক, শেষে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিলেন সব জায়গায়। এইসব আগে কখনোই দেখিনি আমি, তবে এটুকু বুঝতে পারলাম যে কোনো অশুভ শক্তিতে দূরে রাখতে চাইছেন উনারা... যেন আমি নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি।

এরপর টানা কয়েকদিন ভালো ঘুম হলো। শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো আমার। ঘোরলাগা সেই ভাবটাও চলে গেল।

রাতের বেলা সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা আর হতো না, খারাপ স্বপ্নগুলোও হানা দেওয়া বন্ধ করেছিলো! কারমিল্লার সাথে সাথে ওরাও যেন বিদায় নিয়েছিলো আমার পৃথিবী থেকে!

যাইহোক পাঠকেরা, আপনারা কি ওই অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের ব্যাপারে শুনেছেন? যাদের আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে স্টিরিয়ার উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশে*... ছড়িয়ে আছে মোরাভিয়া, সাইলেসিয়া এবং তুর্কি অধিকৃত সার্বিয়াতে... পোল্যান্ড এবং রাশিয়াও মুক্তি পায়নি ওদের অপার্থিব থাবা থেকে... ওদেরকে বলে ভ্যাম্পায়ার... রক্তচোষা একদল প্রেত। যারা মরে গিয়েও বেঁচে থাকে।

এদের অস্তিত্ব কোনো দেশের সরকারই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে না। শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই যদি সংগ্রহ করা হয় তবে ভ্যাম্পায়ারের কারণে মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর বিরাট একটা সংগ্রহ প্রস্তুত করা সম্ভব। দিনের শেষে এগুলোও তো হত্যাকাণ্ড, তাই না? যদি ভবিষ্যতে এমন কোনো উদ্যোগ

---

* মূল বইতে আছে আপার এবং লোয়ার স্টিরিয়া। আপার স্টিরিয়া বলতে স্টিরিয়ার উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং লোয়ার স্টিরিয়া বলতে স্টিরিয়ার দক্ষিণ অংশ বোঝায়।

নেওয়া হয় তবে সম্ভবত আর সরকারিভাবে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব অস্বীকারের উপায় থাকবে না।

কিন্তু তারপরেও, বিজ্ঞানের মাধ্যমে এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, তাই কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলবেই।

দিনের শেষে নিজের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় আর কিছুই তো হতে পারে না, তাই না? আমার কথাই ধরুন। ভ্যাম্পায়ারের শিকার হওয়ার আগে কি আমিও এসব বিশ্বাস করতাম? যে অভিজ্ঞতা হয়েছে... যা দেখেছি এসব আধুনিক চিন্তা-চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের প্রাচীন তন্ত্র আর নিষিদ্ধ জ্ঞানের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন যে ওরা প্রায় সবাই-ই ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

যাইহোক, কারমিল্লা উধাও হওয়ার পরদিন সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কার্নস্টাইনে বসেছিলো এক বিশেষ 'বিচারসভা'।

সবার সামনেই কাউন্টেস মিরকাল্লার সমাধি উন্মুক্ত করা হলো। কফিন খোলার পরেই বাবা আর জেনারেল দুজনেই শনাক্ত করলেন নিজেদের সেই সুন্দরী অতিথিকে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো 'কারমিল্লা' আর 'মিল্লারকা' নামে... যার কারণে মৃত্যু ঘটেছে জেনারেলের নিষ্পাপ ভাতিঝির! অদ্ভুত ব্যাপার হলো মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পেরিয়ে গেলেও কাউন্টেস মিরকাল্লার দেহের কোনো বিকৃতি ঘটেনি... সবকিছু আগের মতোই আছে! যেন কফিনে অনন্তকাল ধরে শুয়ে আছে একটা জীবন্ত মেয়ে! ওর চোখদুটো খোলা, কোনো পচা গন্ধও নেই। দুজন ডাক্তার ছিলেন ঘটনাস্থলে, একজন এসেছিলেন সরকারের তরফ থেকে, আরেকজনকে জেনারেল নিয়ে গেছিলেন। দুজনেই মিরকাল্লার দেহটা পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন! মৃদু হৃৎস্পন্দন আছে... শ্বাস-প্রশ্বাসও চলছে!

দুজনেই মেনে নিলেন যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা নেই।

দেহের প্রতিটি অঙ্গ সতেজ... আর নমনীয়... এত বছর পর একটা রক্ত-মাংসের শরীর এভাবে অবিকৃত থাকে কী করে?

সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপারটার কথা তো বলিইনি। সিসা দিয়ে বিশেষভাবে বানানো কফিনটা রক্তে রীতিমতো থইথই করছিলো আর তার প্রায় সাত ইঞ্চি

গভীরে ডুবে ছিলো দেহটা!

উপস্থিত কয়েকজন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলো!

কারমিল্লা বা কাউন্টেস মিরকাল্লা যে একটা রক্তোচোষা প্রেত বা ভ্যাম্পায়ার সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী দেহটাকে কফিন থেকে তুলে ধরা হলো, তারপর একটা কাঠের কীলক বসিয়ে দেওয়া হলো হৃৎপিণ্ড বরাবর! একটা তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে গেল নিস্তব্ধ পরিবেশ... যে মানুষদের এতদিন কষ্ট দিয়ে এসেছে তাদের হাত থেকেই মুক্তি পাওয়ার জন্য এক প্রাচীন ভ্যাম্পায়ারের শেষ আকুতি! তারপর এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলা হলো মাথাটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো... দ্বিতীয় মৃত্যুর রক্ত! দেহ এবং মাথাটা খানিক পরে ফাঁকা জায়গায় জড়ো করে রাখা কাঠের ওপর রেখে পুড়িয়ে ফেলা হলো... এভাবেই ছাই হয়ে গেল কাউন্টেস মিরকাল্লা... আমার বান্ধবী 'কারমিল্লা'।

এরপর সেই ছাই জড়ো করে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

এরপর থেকে পুরো অঞ্চলে আর কখনো ভ্যাম্পায়ারের উৎপাতের কথা শোনা যায়নি।

এই ঘটনা নিশ্চিত করে সরকারি প্রতিনিধিদল এবং ঘটনাস্থলে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার সই করা একটা নথি এখনো বাবার কাছে আছে। ওই নথির সাহায্যেই আমি সেই ঘৃণ্য ভ্যাম্পায়ারকে শেষ করার বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরলাম।

ষোড়শ অধ্যায়

শেষ কথা



কী মনে হয়? এসব লিখতে আমার খুব ভালো লাগছে? এত কিছু পড়ার পরেও যদি আপনার এটাই মনে হয় তবে আমার আর কিছু বলার নেই। কী তীব্র অস্বস্তি আর উত্তেজনা নিয়ে যে এসব লিখে শেষ করছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। বিশেষ কিছু মানুষ যদি আগ্রহ দেখিয়ে একাধিকবার অনুরোধ না করতেন তবে এই অসাধ্য সাধন আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। ওই অপার্থিব আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার পর টানা কয়েক মাস মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। এই যে এতগুলো বছর কেটে গেছে, তারপরেও মাঝে মাঝে ওই মুখটা ভেসে ওঠে আমার দুঃস্বপ্নে... একাকী বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না... ভয় করে... যদি ও আবার আসে? পরিপূর্ণ মানসিক শান্তির কোনো স্থান নেই আমার জীবনে।

আচ্ছা, দৃশ্যপটে হুট করেই আসা সেই অদ্ভুত লোকটা, মানে ব্যারন ভোর্ডেনবার্গ সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়। উনি না থাকলে কোনোভাবেই কাউন্টেস মিরকাল্লার সমাধি খুঁজে পাওয়া যেত না। ভদ্রলোকের কাছে আমরা সবাই আজন্ম কৃতজ্ঞ। তাই উনাকে নিয়ে কিছু না লিখলে রীতিমতো অন্যায় হবে।

ভদ্রলোকের বাস গ্রেজ শহরে। উনার পূর্বপুরুষেরা অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। বর্তমানে স্টিরিয়ার উত্তরে কিছু বাড়িঘর, জমি-জমা আর উপাধিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই দিয়েই কোনোভাবে চলে যায় তার, অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ। জীবনের বেশ বড় একটা অংশ তিনি ব্যয় করেছেন এই ঘৃণ্য রক্তপিশাচদের নিয়ে গবেষণায়। ইতিহাসের যেসব ঘটনায় এদের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, সেগুলো প্রায় সবই উনার জানা। শুধু তা-ই নয়, এই সংক্রান্ত যত লেখালেখি আর গবেষণা হয়েছে সেগুলোও ছিলো তার নখদর্পনে।

'মেজিয়া পস্তুমা', *'ফ্লেগন ডি মিরাব্লিয়াস'*, *'অগাস্টিনাস ডি কুরে প্রো মরটিয়াস'*, *জন ক্রিস্টোফার হেরেনবার্গের 'ফিলোসফিকে এট ক্রিস্টিয়ানে কগাইটিশনেস ডি ভ্যাম্প্রিরিস'*... এবং আরো হাজার বই ছিলো উনার সংগ্রহে। এই কটার নাম মনে আছে কারণ বাবাকে উনি বইগুলো পড়তে দিয়েছিলেন। এছাড়া ভ্যাম্পায়ারের বিচার সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর বেশ বড় একটা সংগ্রহ ছিলো তার কাছে। সেগুলো থেকেই তিনি জেনেছিলেন কী কী উপায়ে শেষ করা যায়

এই শয়তান রক্তপিশাচদের। একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই পিশাচদের জীবনধারা কোনো ভয়ংকরতম নাটককেও হার মানায়। এরা কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে, আর মাঝে মাঝেই উঠে আসে মানব সমাজে। তখন এদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে এরা আসলে মানুষের রূপ ধরে থাকা কিছু প্রেত! একদম সুস্থ-সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে... শুধু কি তা-ই? এদের কফিন খুললে দেহটা একদম অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। শতশত বছরেও কোনো পচন ধরে না! ঠিক যেমনটা হয়েছিলো কাউন্টেস কার্নস্টাইনের ক্ষেত্রে।

কবরের মাটি না সরিয়েই বা কফিনের ডালা না খুলেই ভ্যাম্পায়াররা কী করে বেরিয়ে আসে আবার কী করে নির্দিষ্ট সময় পর কবরে ফিরে যায় তা কোনো বিশেষজ্ঞই ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কবরের মধ্যে ওরা মূলত বিশ্রাম নেয়, আরো ভালো করে বললে ঘুমায়... মানুষ বা অন্য কোনো রূপে ঘুরে বেড়ানোতে যে শক্তি খরচ হয় তা অনেকটা ফিরে পাওয়া যায় এই নিদ্রাতে... এদের অদ্ভুত দ্বৈত জীবনের অপরিহার্য অংশ এই ঘুম। তীব্র রক্ততৃষ্ণা এদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে... এই সর্বনাশা তৃষ্ণা মেটে শুধুই মানুষের রক্তে।

কোনো বিশেষ মানুষকে পছন্দ হলে তার রক্ত চোষার জন্য পাগল হয়ে ওঠে এরা, ওই মানুষটাকে নিজের মতো করে পেতে চায়... নিজের মতো বানাতে চায়! এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কোনো বাধা অতিক্রমেই পিছপা হয় না তারা, অসীম ধৈর্য অবলম্বন করে... আশ্রয় নেয় নানান কৌশলের। এরা যে কতরকম ভোজবাজি দেখাতে পারে তার ইয়ত্তা নেই! নিজের কাম্য শিকারের শরীরের সকল রক্ত চুষে তৃষ্ণা মিটিয়ে তবেই শান্ত হয় এই পিশাচেরা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এইসব ক্ষেত্রে এদের আচরণ খুনীর মতো হয় না, বরং এরা নিজেকে শিকারের প্রেমিক বা প্রেমিকা ভাবতে থাকে। নানাভাবে শিকারকে বোঝাতে চায় যে এই পৃথিবীতে সে-ই তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে... শিকার হওয়া মানুষটা ঘোরলাগা অবস্থায় চলে যায়, বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় এদের কথা। ধীরে ধীরে বেশ কয়েকবার রক্ত চুষে খেয়ে মানুষটার প্রাণশক্তি শুষে নেয় এই পিশাচেরা।

আবার বলছি, এসব ঘটে শুধুমাত্র তখনই যখন কাউকে এদের পছন্দ হয়। শুধুমাত্র রক্ততৃষ্ণা মিটাতে যে শিকারগুলো এরা করে সেক্ষেত্রে দেখা যায়

মানুষটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে অজ্ঞান করে, একবারেই তার রক্ত চুষে শেষ করে দেওয়া হয়। ঠিক এমনই মৃত্যু জুটেছিলো বেশিরভাগ গ্রামবাসী মেয়েগুলোর।

বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশে নানান কৌশল অবলম্বন করে ভ্যাম্পায়ারেরা। যেমন কাউন্টেস মিরকাল্লা হলো তার পুরো নাম। এই নাম বললে এলাকার অনেক বয়স্ক মানুষই তাকে চিনে ফেলতে পারে, সন্দেহ করতে পারে। তাই সে নিজের নামের অক্ষরগুলোকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নতুন কয়েকটা নাম বানিয়েছিলো।

মানুষের কাছে এই নামগুলোই বলত সে। যেমন – কারমিল্লা আর মিল্লারকা!

কারমিল্লা অধ্যায়ের সমাপ্তির পরের দুই-তিন সপ্তাহ আমাদের প্রাসাদে ছিলেন ব্যারন ভোর্ডেনবার্গ। একদিন বাবা উনার সাথে সেই বিখ্যাত মোরাভিয়ান ভদ্রলোক আর কার্নস্টাইন পরিবারের লোকেদের ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নানান আলোচনা করছিলেন।

"আচ্ছা ব্যারন, আপনি কী করে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাউন্টেস মিরকাল্লার কবরটা অত সহজে খুঁজে বের করলেন?" তাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা।

রহস্যময় হাসিতে কুঁচকে গেল ব্যারনের অদ্ভুত মুখটা।

মেঝের দিকে চেয়ে নিজের ভাঙা চশমার বাক্সটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন তিনি, তারপর মুখটা তুলে আবার মৃদু হেসে বললেন, "ওই মোরাভিয়ান ভদ্রলোকের লেখা কিছু দিনলিপি আর অন্যান্য কাগজ আমার কাছে আছে। নিজের নানান অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তিনি ওগুলোতে, তবে সবচেয়ে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কার্নস্টাইনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা... আপনি এতক্ষণ যা বললেন, তা খুবই সামান্য। আমি পুরোটা জানি। আসলে উনার কাহিনি লোকের মুখে মুখে এই অঞ্চলে প্রচুর ছড়িয়েছে, কালের বিবর্তনে বিকৃতও হয়েছে অনেক। উনাকে আপনাদের এলাকার লোকেরা বলে 'মোরাভিয়ান ভদ্রলোক', হ্যাঁ... বলাই যায়। উনি দীর্ঘকাল আগেই মোরাভিয়াতে স্থায়ী হয়েছিলেন, বেশ উচ্চবংশের মানুষ ছিলেন। কিন্তু আসলে উনি ওখানকার নন। শুনে অবাক হবেন যে উনি আসলে উত্তর স্টিরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন।

"উনার লেখাগুলো থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট যে যৌবনে উনার সাথে সুন্দরী

কাউন্টেস মিরকাল্লা কার্নস্টাইনের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। সেই সম্পর্ক যে কতটা গভীর আর আবেগী ছিলো তা লেখার ধাঁচ থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কাউন্টেসের অকাল মৃত্যুতে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন ভদ্রলোক। যতদূর বুঝেছি মিরকাল্লার মৃত্যুর পিছনে কার্নস্টাইন পরিবারের প্রাক্তন সদস্যদের বেশ ভালো ভূমিকা ছিলো। ভ্যাম্পায়াররা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এমনটা করেই থাকে। এ এক বড়ই অপার্থিব আর নির্মম নিয়ম।

"নিয়মটা কেমন? বুঝিয়ে বলছি। ধরুন একটা অঞ্চল, যেখানে একেবারেই ভ্যাম্পায়ারের উপদ্রব নেই। এখানে ব্যাপারটা শুরু হবে কী করে? ব্যাপারটা শুরু হয় খল প্রকৃতির একজন মানুষের আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। বিশেষ কিছু শয়তানি আচার পালন করে আত্মহনন করলে মৃত্যুর পর একজন মানুষ ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে পারে। এরপর সেই ভ্যাম্পায়ার অসহায় ঘুমন্ত মানুষদের রক্ত চুষে খেয়ে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে... ভ্যাম্পায়ারের শিকারকে সাধারণ মানুষের মতো করে কবর দিলে সে-ও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়! সুন্দরী মিরকাল্লার ব্যাপারটাও ঠিক এমনই ছিলো, কার্নস্টাইন বংশের কোনো ভ্যাম্পায়ারের শিকার ছিলো সে... এবার আসল কথাটা বলি... ওই মোরাভিয়ান ভদ্রলোকের পদবি কী ছিলো জানেন? ভোর্ডেনবার্গ! হ্যাঁ, উনি আমারই পূর্ব-পুরুষ ছিলেন... সেই পদবি আজও বয়ে চলেছি আমি। তো যাইহোক, তিনি জেনে ফেলেছিলেন কার্নস্টাইন বংশের রহস্যের কথা, খোঁজ-খবর আর দীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি আরো অনেক কিছুই জেনেছিলেন।

"তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভয়াবহ রক্ততৃষ্ণা কার্নস্টাইন বংশের ওপর অভিশাপ হয়ে এসেছিলো, আজ বা কাল সেটা তার মৃত প্রেমিকার ওপরও বর্তাবে! প্রেমিকাকে অনেক ভালোবাসতেন তিনি... সেই ভালোবাসার প্রতিমা হয়ে যাবে রক্তপিশাচ! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি এলাকার লোকেরা তার প্রেমিকার কবর খুঁড়ে মৃতদেহটাকে বিকৃত করবে... পুড়িয়ে ফেলবে! প্রেম বড়ই রহস্যময় জিনিস... আর সেই প্রেমের বশেই আমার পূর্বপুরুষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে নিজের প্রেমিকার মৃতদেহটা যেভাবেই হোক, রক্ষা করবেন। এক অদ্ভুত রকমের মিথ্যা গবেষণাপত্র লিখেছিলেন তিনি, যাতে প্রমাণ হয় যে 'বিশেষ পদ্ধতি'তে ভ্যাম্পায়ারদের শেষ করার পরেও তারা মুক্তি পায় না, বরং আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। যাতে করে ওটা দেখিয়ে গ্রামের গণ্যমান্য

ব্যক্তিদের হাত থেকে কাউন্টেসের মৃতদেহ রক্ষা করা যায়।

"তারপর তিনি বিদেশী পরিচয়ে এখানে এলেন, একটা ভ্যাম্পায়ারকে শেষ করলেন, তারপর বোকা লোকদের বোঝালেন যে এভাবে নয়... বরং ভ্যাম্পায়ারদের হাত থেকে মুক্তির উপায় হলো তাদের কবর সরিয়ে নেওয়া। যাইহোক, কাউন্টেসের মৃতদেহ তিনি সরাননি, বরং স্মৃতিস্তম্ভটা দেয়াল তুলে আড়াল করে দিয়েছিলেন। এর ফলে ওখানে যে কারো কবর থাকতে পারে তা বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর অনেক বছর পেরিয়ে গেল, বয়স হলো তার... ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন যে কী ভয়ংকর একটা ভুল করেছেন! উনার এই কাজের জন্য পুরো গ্রাম হুমকির মুখে। তীব্র আতঙ্কে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছিলেন। তার যে ভুল হয়েছে তা দিনলিপিতে অসংখ্যবার স্বীকার করেছেন। কবরস্থানের নকশা একে কাউন্টেসের কবর খুব সুন্দর করে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন তিনি, সে কারণেই আমি এতদিন পর এখানে এসে মুক্তি দিতে পারলাম মিরকাল্লাকে। সম্ভবত উনি নিজেই এখানে এসে কাউন্টেসকে শেষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই উনার মৃত্যু হয়! ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কাউন্টেসের রক্ততৃষ্ণার শিকার হয়ে প্রচুর মানুষ প্রাণ দেয়... গ্রামটাও ফাঁকা হয়ে যায়! যাইহোক, পূর্বপুরুষের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি বলে খুবই ভালো লাগছে।"

আরো অনেক ব্যাপারে কথা হয়েছিলো আমাদের। তার মধ্যে কিছু কথা লিখে রাখা প্রয়োজন।

ব্যারন বলেছিলেন, "ভ্যাম্পায়ারদের কবজির জোর হয় সাংঘাতিক। জেনারেল যখন কুড়াল নিয়ে মিরকাল্লাকে আক্রমণ করতে যান... তখন ওর রোগা হাতটা দিয়ে ওইরকম দানবের মতো মানুষের হাতকে কী শক্ত করে ধরেছিলো মেয়েটা... যেন ওটা হাত নয়, সাঁড়াশি! এবং শুধু শারীরিক শক্তিতেই ওদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় না কিন্তু... ওরা যে জায়গা এঁটে ধরে তা বেশ কিছুক্ষণের জন্য অবশ হয়ে যায়... বেশ অনেকক্ষণ লাগে সবকিছু স্বাভাবিক হতে।"

পরের বসন্তে বাবা আমাকে ইতালি ঘুরতে নিয়ে গেলেন। প্রায় এক বছর প্রাসাদ থেকে দূরে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। ওই অশুভ ঘটনার প্রভাব আমার মন থেকে দূর হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। এখনো

মাঝে মাঝে কারমিল্লাকে দেখি... স্বপ্নে... ঘোরের বশে... কখনো সেই পরমাসুন্দরী রূপে, আলসে মেয়েটা রহস্যময় চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে... আবার কখনো সেই ভয়ংকর রুদ্রমূর্তিতে... কী হিংস্রভাবেই না জেনারেলের হাতটা চেপে ধরেছিলো সে!

একা একা বসে থাকলে মাঝে মাঝেই চমকে উঠি... বসার ঘরে ও কার পায়ের শব্দ? কারমিল্লার না তো? জানি এসবই আমার কল্পনা। কারমিল্লা আর কখনো ফিরবে না!

কিন্তু ওর ভয় সারাটাজীবন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

সমাপ্ত

লেয়ার্ড ব্যারনের বক্তব্য–

কারমিল্লার মায়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার করেননি লেখক। কী হলো তার? সে কি ভ্যাম্পায়ার? তার অনুচরেরা সবাই কি ভ্যাম্পায়ার? গাড়ির মধ্যে যে অদ্ভুত মেয়েটা ছিলো সে-ও কি ভ্যাম্পায়ার?

ওদের কেন ধাওয়া করে শেষ করা হলো না?

এই ব্যাপারটা হয়তো স্ল্যাভিক কিংবদন্তি দিয়ে খানিকটা ব্যাখ্যা করা যায়। এই কিংবদন্তি অনুযায়ী কোনো অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ভ্যাম্পায়ারকে শেষ করে দিলে আর বাকিদের শেষ করার প্রয়োজন হয় না, তারা এমনিতেই মরে যায়।

কারমিল্লাকে শেষ করার ফলেই তার মা এবং বাকি ভ্যাম্পায়াররাও হয়তো শেষ হয়ে গেছে।

লেয়ার্ড ব্যারন
লেখক ও গবেষক,
আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র

অনুবাদকের মন্তব্য – কারমিল্লার মায়ের এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। তবে ব্যাপারটা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন সম্পাদক সাহেব, অনেক পাঠকই এই নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, তাই লেয়ার্ড ব্যারনের গবেষণা থেকে এটুকু তুলে দিলাম। সম্পাদক সাহেবকে ধন্যবাদ।

স্টিরিয়ার নির্জন এক জায়গায় বিরাট প্রাসাদ দুর্গে বাবার সাথে বাস করে লরা। লরার বাবা ইংরেজ হলেও জায়গাটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাই আর দেশে ফেরেননি। ইংল্যান্ড দেখা হয়নি লরার। খানিকটা দূরে কার্নস্টাইন গ্রাম, যেখানে এককালে বাস করতো এই অঞ্চলের শাসক 'কার্নস্টাইন বংশ'। এখন আর সেই বংশের কেউ বেঁচে নেই, গ্রামটাও কোনো এক রহস্যময় কারণে একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেছে! কেউ থাকে না ওখানে... ভয়ে! কীসের ভয়?

হুট করেই ওদের বাড়িতে আগমন ঘটলো এক রহস্যময় অতিথির, লরার বয়সিই একটা মেয়ে। নাম কারমিল্লা... অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি, যেন রূপে স্বর্গের দেবীদেরও হার মানায়। কিন্তু আসলে কে ও? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় ওদের প্রাসাদ? এসব নিয়ে মেয়েটা কেন কিছু বলে না?

জেনারেল স্পিয়েলসডর্ফের ভাতিজির রহস্যময় মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? কাকে হন্য হয়ে খুঁজছেন তিনি?

লরাদের প্রাসাদের আশেপাশের গ্রামগুলোতে কি কোনো রহস্যময় রোগ ছড়িয়ে পড়ছে? যাতে আক্রান্ত হয়ে রক্তশূন্যতায় ভুগে মারা যাচ্ছে মেয়েরা?

প্রতিদিন রাতে কোথায় যায় কারমিল্লা? কী করে বের হয় সে প্রাসাদ থেকে?

হুট করেই কেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে লরা? ভয়াবহ দুঃস্বপ্নগুলো কেন হানা দিচ্ছে ওর স্বপ্নে?

সত্যিই কি এমন কোনো পিশাচ আছে যারা মানুষের রক্ত চুষে নেয়? নাকি সবই পিছিয়ে থাকা পূর্ব ইউরোপের কুসংস্কার?

এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে পৃথিবীর প্রথম সফল ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত উপন্যাসিকা 'কারমিল্লা'য়, যেটি পড়ে ব্রাম স্টোকার তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ড্রাকুলা' লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন!




ISBN 978-984-95826-5-6
9 789849 582656